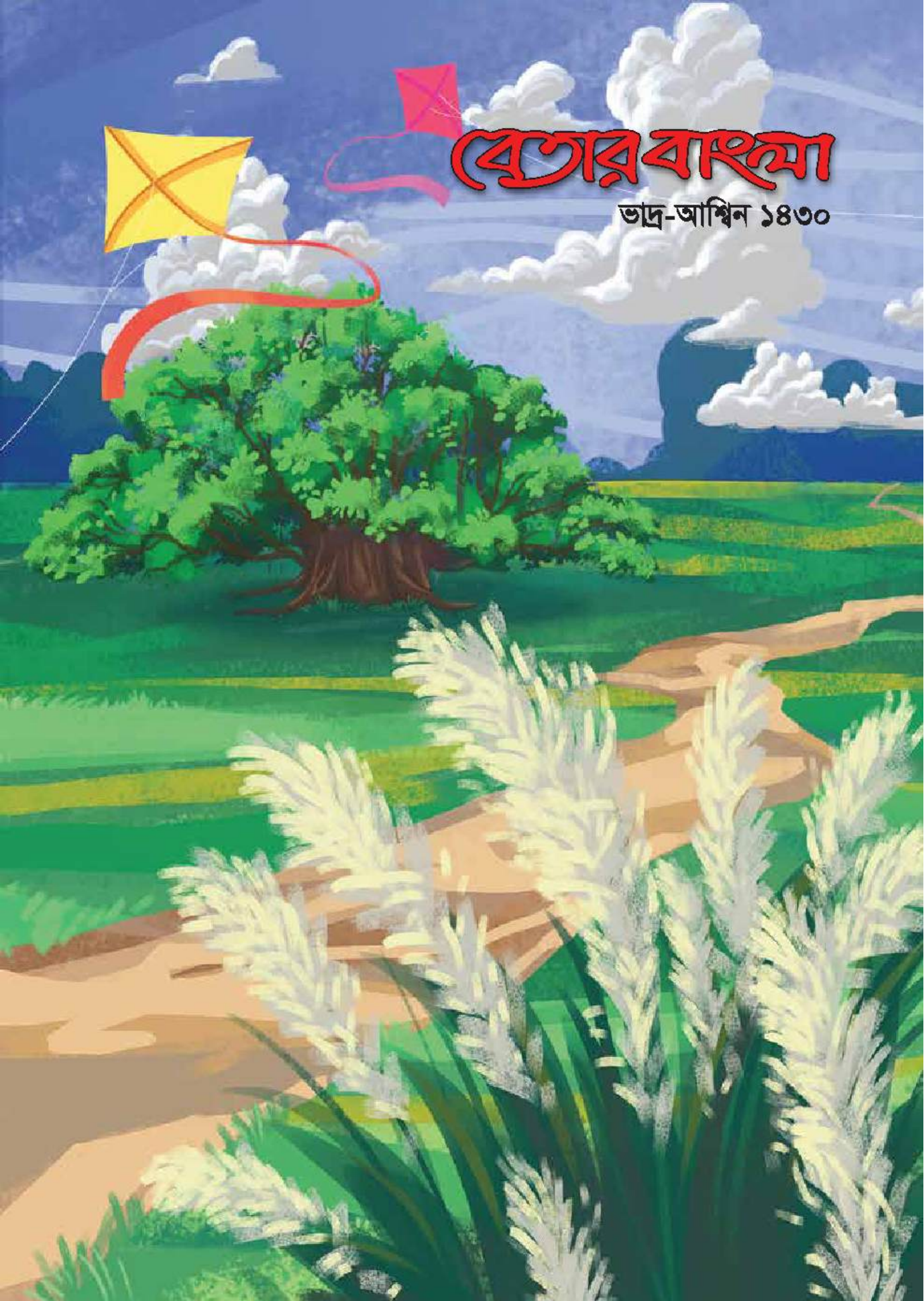
বেতারবাংলা
ভাদ্র-আশ্বিন ১৪৩০

১৫ আগস্ট ২০২৩ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবসে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে নীরবে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন

২৬ আগস্ট ২০২৩ তারিখে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন বঙ্গভবন দরবার হলে অ্যানিমেশন মুভি 'মুজিব ভাই' এর প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন

২৮ আগস্ট ২০২৩ তারিখে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন এঁর সাথে বঙ্গভবনে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী সাক্ষাৎ করেন

বেতারবাংলা

দ্বি-মাসিক পত্রিকা

ভাদ্র-আশ্বিন ১৪৩০ • ১৬ আগস্ট ২০২৩ - ১৬ অক্টোবর ২০২৩

সম্পাদকীয়

'শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি, ছড়িয়ে গেল ছাপিয়ে মোহন অঙ্গুলি।' এভাবেই বাঙালির সামনে শরতের সৌন্দর্য উপস্থাপন করেছেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কালের ধারায় সজীবতা, রং, রূপ ও স্নিগ্ধতার নাম শরৎ। বর্ষার বর্ষণ আর মেঘবালিকার গুরুগুরু গর্জন থামিয়ে শরৎ নিয়ে আসে অপরূপ স্নিগ্ধতা। শরতের রূপ মানে আকাশের নরম নীল ছুঁয়ে শিমুল তুলার মতো ভেসে চলা সাদা মেঘের ভেলা, সকালের শিশির, কাশফুলের সাদা এলোকেশের দোলা। শুধু কি তাই! ভেসে বেড়ানো মেঘের প্রান্ত ছুঁয়ে উড়ে চলা পাখির ঝাঁক, বাঁশবনে ডাহুকের ডাকাডাকি, বিলঝিলের ডুবো ডুবো জলে জড়িয়ে থাকা শালুক পাতা, মোহনীয় চাঁদনী। হয়তো এ জন্য বলা হয়ে থাকে, প্রকৃতিতে শরৎ আসে 'নববধূর মতো।' আমরা মানুষরা শুধু লোভীর মতো প্রকৃতির কাছ থেকে খাদ্য চাই। কিন্তু প্রকৃতিকে টিকিয়ে রাখার জন্য কিছুই করি না। ফলে কাশের বন কিছুটা ম্লান হলেও প্রকৃতিকে রাঙানোর চেষ্টায় ত্রুটি রাখছে না শরৎ। আমাদের দু'দন্ড বিশ্রামের সুযোগ করে দিচ্ছে।

কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যে বিদ্রোহী কবি হিসেবে সমধিক পরিচিত হলেও তিনি ছিলেন একাধারে কবি, সংগীতজ্ঞ, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক, চলচ্চিত্রকার, গায়ক ও অভিনেতা। প্রেম, দ্রোহ, সাম্যবাদ ও জাগরণের কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা ও গান শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগ্রামে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছে, বাংলা সাহিত্যেও সৃষ্টি করেছিল নবজাগরণের । মুক্তিযুদ্ধে তাঁর গান ও কবিতা ছিল আমাদের প্রেরণার উৎস। তাঁর কবিতা ও গান মানুষকে যুগে যুগে শোষণ ও বঞ্চনা থেকে মুক্তির পথ দেখিয়ে চলছে। নজরুল ছিলেন চির প্রেমের কবি, যৌবনের দূত। বিদ্রোহী কবির প্রেমিক রূপটিও প্রবাদপ্রতিম। তাই মানুষটি অনায়াসেই বলতে পারেন, 'আমার আপনার চেয়ে আপন যে জন খুঁজি তারে আমি আপনায়।' ১৩৮৩ বঙ্গাব্দের ১২ ভাদ্র ঢাকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে (সাবেক পিজি হাসপাতাল) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন আমাদের জাতীয় কবি। কবিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হয়। মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁকে পরম শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় স্মরণ করছি।

সংকট, চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ৭৬ বছর অতিক্রম করলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছার জ্যেষ্ঠ সন্তান তিনি। শত বাধা-বিপত্তি এবং হত্যার হুমকিসহ নানা প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে তিনি সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার আদায়ের জন্য অবিচল থেকে সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশের জনগণ অর্জন করেছে গণতন্ত্র ও বাক-স্বাধীনতা। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত হতে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছে। আর্থ-সামাজিক খাতে দেশ অভূতপূর্ব অগ্রগতি অর্জন করেছে। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। নিজের অর্থে পদ্মা সেতুর মতো বড় প্রকল্প বাস্তবায়নের সক্ষমতা অর্জন করেছে বাংলাদেশ। নির্মাণ হচ্ছে স্মার্ট বাংলাদেশ। স্বপ্নযাত্রার সারথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিনে তাঁকে জানাই কৃতজ্ঞতা, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

নবী-রাসুলগণের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)। মানবতার কল্যাণ তথা বিশ্বশান্তির ও বিশ্বমানবতার কল্যাণের জন্য, দুনিয়ার শান্তি ও পরকালে মুক্তির পথনির্দেশনার জন্য বিশ্বনবী (সাঃ) -কে পাঠানো হয়েছে। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা ও অহিংস নীতি গুরুত্বপূর্ণ। বার রবিউল আউয়াল মক্কা নগরের কুরাইশ বংশে ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬৩২ খ্রিস্টাব্দের একই দিনে ইহলোক ত্যাগ করেন। ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী হচ্ছে শেষ নবীর জন্মদিন হিসেবে সারা বিশ্বের মুসলমানদের মাঝে পালিত একটি উৎসব। মহানবী (সাঃ) এর প্রতি ভক্তি, ভালোবাসা ও তাঁকে অনুসরণ এক একিভূত প্রক্রিয়া। জীবনের সকল পর্যায়ে তাঁর নির্দেশনা অনুসরণই হতে পরে আমাদের পাথেয়।

আঞ্চলিক পরিচালক
মর্জিনা বেগম

সম্পাদক
মোহাম্মদ রাফিকুল হাসান

বিজনেস ম্যানেজার
মোঃ শরিফুর রহমান

সহ সম্পাদক
সৈয়দ মারুফ ইলাহি

প্রচ্ছদ
জামান পুলক

আলোকচিত্র
বেতার প্রকাশনা দপ্তর, পিআইডি,
বাংলাদেশ বেতারের কেন্দ্র ও ইউনিটসমূহ

মুদ্রণ সংশোধক
মোঃ হাসান সরদার

প্রকাশক
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

বেতার প্রকাশনা দপ্তর
জাতীয় বেতার প্রশাসন ভবন
৩১, সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ সরণি
শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০২-৪৪৮১৩০০৬ (আঞ্চলিক পরিচালক)
০২-৪৪৮১৩০৫৩ (সম্পাদক)
০২-৪৪৮১৩০০৯ (বিজনেস ম্যানেজার/ম্যানেজার)
ওয়েবসাইট: www.betar.gov.bd
ইমেইল: betarbanglabd@gmail.com
ফেসবুক: /betarbangla.bb

নামলিপি
কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য
প্রতি সংখ্যা: ২০ টাকা
ডাকমাশুলসহ প্রতি সংখ্যা: ৩০ টাকা

প্রোডাকশন
দশদিশা প্রিন্টার্স

সূচিপত্র

ভাদ্র-আশ্বিন ১৪৩০ • ১৬ আগস্ট ২০২৩ - ১৬ অক্টোবর ২০২৩

প্রবন্ধ-নিবন্ধ

শেখ মুজিব আমার পিতা
শেখ হাসিনা — ৩

আপনার প্রত্যাবর্তন আজও শেষ হয়নি
ড. আতিউর রহমান — ৪

নিউ মিডিয়া: বাংলাদেশ বেতারের নতুন মহাসড়ক
নাসরুল্লাহ মোঃ ইরফান — ৮

নজরুল কাব্যের জনপ্রিয়তা ও অপরাপর কাব্যসত্য
মোহাম্মদ আজম — ১২

নজরুল কাব্যে বিদ্রোহের আগুন
আরিফা খানম — ২০

হিলফুল ফুযূল
ড. মোঃ আবদুল কাদির — ২২

শ্রীকৃষ্ণের শুভ জন্মতিথি জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে একটি বিশেষ রচনা যুগে যুগে নানা রূপে
শ্যামল দত্ত — ২৮

গণসম্প্রচারের ইতিবৃত্ত (১৯২২ থেকে ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ): বাংলাদেশ প্রেক্ষিত (৪র্থ পর্ব)
দেওয়ান মোহাম্মদ আহসান হাবীব — ৩২

সচেতন হই ডেঙ্গুর প্রকোপে
ডা. শরদিন্দু শেখর রায় — ৩৫

গল্প

সাঁঝের তারা
কাজী নজরুল ইসলাম — ১৬

তোমরা নয় তুমিই একজন
শেলী সেনগুপ্তা — ২৪

বেতার সংবাদ — ৯৭

বেতার অ্যালবাম — ১০৩

বেতার পর্ব

কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনা — ৪৩

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনা — ৫৫

পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনা — ৬৪

বাংলাদেশ বেতারের জাতীয় ও স্থানীয় সংবাদ — ৭২

বাংলাদেশ বেতার হতে প্রচারিত অনুষ্ঠানের দৈনিক সময়সূচি — ৭৪

বাংলাদেশ বেতারের এফ.এম. ট্রান্সমিটারসমূহ — ৭৬

বাংলাদেশ বেতার থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানের সচিত্র প্রতিবেদন — ৮৫

কবিতা

বত্রিশ নম্বর
কামাল চৌধুরী — ৭

তোমার জন্মদিন
ইসমত আরা পলি — ৭

রাসূলের শানে
গোলাম নবী পান্না — ১৯

দুখু'র জয়
কল্পনা সরকার — ১৯

শরতের বারতা
রওশন আরা পম্পা — ১৯

রাহুগ্রস্ত চাঁদের মতো
আবু জাফর আবদুল্লাহ — ২৭

এক হৃদস্পন্দন
কামাল বারি — ২৭

কেঁপে ওঠে সেলাইয়ের ঠোঁট
শাহীন আল মামুন — ২৭

খুঁজছি আমি শ্যামলিকেই
জহীর হায়দার — ৩১

উপহার
বাশরী মহন দাস — ৩১

এক জোড়া চক্ষু
ফজলুল হক সিদ্দিকী — ৩১

তরুপল্লব

ভাইরাস
সুবর্ণা অধিকারী — ৩৮

মন ছুটে যায়
মো. তাইফুর রহমান — ৩৯

গাঁয়ের মানুষটাকে
রাজীব হাসান — ৩৯

চঞ্চল চাঁদ
তমজ্যোতি নবনী — ৩৯

শরৎ হাওয়া
মুহাম্মদ ইসমাঈল — ৩৯

স্বপ্ন ঘুড়ি
সানজিদা আকতার আইরিন — ৩৯

রেড ২৫০
রাহিন হাসান — ৪০

রাজার ধন ও ধূর্ত মন্ত্রী
পারিজাত — ৪১

ডেয়ারফাইট
পাহি লীলাবতী — ৪১

বেতার শ্রোতা ও গায়কের পাতা — ১০৬

অনেক রাত হবে। দোতলায় মায়ের ঘরে খাটে আমারা সবাই। মা, আব্বা, ভাই-বোন কেউ শুয়ে, কেউ বসে খুব গল্পকরছি। আব্বাও অনেক কথা বলছেন, আমরা শুনছি। সেই আগের মতো ৩২নং বাড়িটায় সবাই আছি। বাড়িটা একদম বিধ্বস্ত। এখানে ওখানে গুলির দাগ। আমার ঘরের পাশে ছোট্ট একটা ঘরে আলনা ও একটা আলমারি রাখা আছে। বড় একটা আয়না রয়েছে। ঐ আয়নায় গুলি করেছে ফলে অর্ধেক আয়না ভেঙে গেছে। বাড়ির ইটগুলি অনেকখানি বেরিয়ে আছে। এদিকে দরজায় একটা শাড়ি ছিঁড়ে দু'টুকরো পর্দা ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। মায়ের কোলের কাছে শুয়েছিলাম আমি। উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে আমার ঘরে ঢুকলাম...

হঠাৎ টেলিফোনের শব্দে ঘুমটা ভেঙে গেল। বুঝে উঠতে কিছুটা সময় লাগল যে আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম। কেন যেন মনটা ভীষণ হয়ে গেল। স্বপ্নটা পুরো দেখা হল না। ফোনটার উপরই মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। প্রায়ই এমন স্বপ্ন দেখেছি যে সেই আগের মতো সবাই একসঙ্গে ঐ বাড়িতে।

অনেক স্মৃতিভরা ধানমন্ডি ৩২ নং সড়কের বাড়ির জীবনে যেন চলে যাই। সেই আগের মতো সবাই আছে। একসঙ্গে হাসছি, কথা বলছি, কখনও রাগ করছি, ভাই বোন খুনসুটি করছি। কখনও মিছিল আসছে। কত স্মৃতি। স্মৃতি বড় মধুর। আবার স্মৃতি অনেক বেদনার, যন্ত্রণার। ঘুম ভেঙে বাস্তব জগতে এলেই সেই যন্ত্রণা কুরে কুরে খায়। যত দিন বেঁচে রব এ যন্ত্রণা নিয়েই বাঁচতে হবে।

আমরা তো চিরদিন থাকবনা কিন্তু এই ঐতিহাসিক বাড়িটি জনগণের সম্পদ হিসেবে সব স্মৃতির ভার নিয়ে ইতিহাসের নীরব সাক্ষী হয়ে থাকবে। এখানেই আমাদের সান্ত্বনা। আমরা ১৯৬১ সালের ১ অক্টোবর এই বাড়িটিতে আসি। তারপর থেকে কত গুরুত্বপূর্ণ সভা এই বাড়িটিতে হয়েছে। এই ১৯৬১ সাল থেকে'৯১ সাল পর্যন্ত কত ঘটনা এই বাড়ি ঘিরে। মাঝখানে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ৮১ সালের ১১ জুন পর্যন্ত বাড়ি বন্ধ ছিল। আব্বা শাহাদাত বরণ করার পর ওরা বাড়িটি সিল করে দেয়। তারপর আর কেউ প্রবেশ করতে পারেনি।

মনেপড়ে ১৯৬২ সালে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। মণি ভাই এই বাড়ি থেকে নির্দেশ নিয়ে যেতেন, পরামর্শ নিতেন। ১৯৬২ সালে আব্বা গ্রেফতার হন। তখনকার কথা মনে পড়ে খুব। আমি ও কামাল পেছনের শোবার ঘরে থাকি, মাঝখানে বাথরুম, তারপরই মার শোবার ঘর। তখনও বাড়িটি সম্পূর্ণ হয়নি। আমরা যখন এ বাড়িতে এসে উঠি তখন কেবল দুটো শোবার ঘর আর মাঝের বসার ঘরটা হয়েছে। ওর অর্ধেকটায় খোকা কাকা, লো ভাই, মণি ভাইসহ অনেক আত্মীয়-স্বজন থাকতো। মাঝখানে পশ্চিম দিকে ছোট্ট একটা বসার ঘর তখনও অসমাপ্ত। রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, দেখি বাইরে টিপটিপ বৃষ্টি, তারমধ্যে পুলিশ। জানালার পাশে একজন দাঁড়িয়ে আর একজন অত্যন্ত সতর্কভাবে গুটি গুটি পা ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে। আমি পর্দার পাশে, ঘর অন্ধকার তাই আমাকে দেখতে পায়নি। তাড়াতাড়ি কামালের খাটের কাছে গেলাম। ওকে ধাক্কা দিয়ে ওঠাতে চেষ্টা করলাম। ও চোখ খুলল, 'হাসুপা কি?'

আমি বললাম, 'পুলিশ বাড়ি ঘিরে ফেলেছে।' একথা বলেই তাড়াতাড়ি বাথরুমের দরজার কাছে গিয়ে মাকে ডাকলাম। মা ও আব্বা যখন টের পেয়ে গেছেন। মা বললেন, 'তোমার আব্বাকে ওরা অ্যারেষ্ট করবে।' ঐ বাড়ি থেকেই আব্বাকে বন্দি করে নিয়ে গেল। প্রায় পাঁচ ছয় মাস আব্বা জেলে থাকেন।

১৯৬৪ সালের অক্টোবরে রাসেলের জন্ম। তখনও বাড়ির দোতলা হয়নি, নিচ তলাটা হয়েছে। উত্তর-পূর্ব কোণে আমার ঘরেই রাসেলের জন্ম হয়। মনে আছে আমাদের সে কি উত্তেজনা! আমি, কামাল, জামাল, রেহানা, খোকা কাকা অপেক্ষা করে আছি। বড়ফুফু, মেজফুফু তখন আমাদের বাসায়। আব্বা তখন ব্যস্ত নির্বাচনী প্রচার কাজে। আইয়ুবের বিরুদ্ধে ফাতেমা জিন্নাহকে প্রার্থী করা হয়েছে সর্বদলীয়ভাবে। বাসায় আমাদের একা ফেলে মা হাসপাতাল যেতে রাজি না। তাছাড়া এখনকার মতো এত ক্লিনিকের ব্যবস্থা তখন ছিলনা। এসব ক্ষেত্রে ঘরে থাকারই রেওয়াজ ছিল। ডাক্তার-নার্স সব এসেছে। রেহানা ঘুমিয়ে পড়েছে। ছোট্ট মানুষটা আর কত জাগবে। জামালের চোখ ঘুমে ঢুলঢুল, তবুও জেগে আছে কষ্ট করে নতুন মানুষের আগমনবার্তা শোনার অপেক্ষায়। এদিকে ভাই না বোন! ভাইদের চিন্তা আর একটা ভাই হলে তাদের খেলার সাথী বাড়বে, বোন হলে আমাদেও লাভ। আমার কথা শুনবে, সুন্দর সুন্দর ফ্রক পরানো যাবে, চুল বাধাঁ যাবে, সাজাব, ফোটো তুলব, অনেক রকম করে ফোটো তুলব। অনেক কল্পনা মাঝে মাঝে তর্ক, সেই সঙ্গে গভীর উদ্বেগ নিয়ে আমরা প্রতি মুহূর্ত কাটাচ্ছি। এর মধ্যে মেজ ফুফু এসে খবর দিলেন ভাই হয়েছে। সব তর্ক ভুলে গিয়ে আমরা খুশিতে লাফাতে শুরু করলাম। ক্যামেরা নিয়ে ছুটলাম। বড় ফুফু রাসেলকে আমার কোলে তুলে দিলেন। কি নরম তুলতুলে। চুমু খেতে গেলাম, ফুফু বকা দিলেন। মাথা ভর্তি ঘন কালো চুল, ঘাড় পর্যন্ত একদম ভিজা। আমি ওড়না দিয়ে ওর চুল মুছতে শুরু করলাম। কামাল, জামাল সবাই ওকে ঘিরে দারুণ হইচই।

আপনার প্রত্যাবর্তন আজও শেষ হয়নি

ড. আতিউর রহমান

আগস্ট বাঙালির দুঃখের মাস। এ মাসেই আমরা বঙ্গবন্ধু, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, কাজী নজরুল ও শামসুর রহমানের মতো বাঙালি উজ্জ্বল নক্ষত্রদের হারিয়েছি। বিশেষ করে '৭৫-এর এই মাসের ১৫ তারিখে আমরা বাংলাদেশের আরেক নক্ষত্র জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হারিয়েছি। কার্যত সেদিন মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশকেই খুন করা হয়েছিল। উদারনৈতিক ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ সেদিন বর্বর আক্রমনের শিকার হয়েছিল। সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন সেদিন খুন হয়েছিল। বহু কষ্টে দিনরাত পরিশ্রম করে শ্মশান বাংলাকে সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সব অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। সুদূরপ্রসারী গণমুখী সংবিধান, প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, শিক্ষা কমিশনসহ নানামুখী স্বপ্নচারী উদ্যোগ নিয়ে বাংলাদেশকে উন্নয়নের অভিযাত্রায় দাঁড় করেছিলেন তিনি। জনগণের অক্লান্ত পরিশ্রম, বলিষ্ঠ নেতৃত্বের দূরদর্শিতায় স্বদেশ হাঁটছিল সোনার বাংলা অভিমুখে। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ছিল মাত্র ৯৩ ডলার। মাত্র তিন বছরের মাথায় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের গুণে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ২৭৩ ডলারে। কৃষি ও শিল্প যুগপৎ উন্নতি করছিল। শিক্ষা ক্ষেত্রে বড় ধরনের বিনিয়োগ হচ্ছিল। বৈরী প্রকৃতি এবং যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য কূটনৈতিক অপতৎপরতা, হঠাৎ বেড়ে যাওয়া তেলের দামের কারণে বাড়ন্ত মূল্যস্ফীতি ও বিপুল খাদ্য ঘাটতি মোকাবিলা করেই তিনি এগোচ্ছিলেন। একাত্তরে বাংলাদেশের অর্থনীতির দুই-তৃতীয়াংশই বিধ্বস্ত হয়েছিল। সেই ধ্বংস স্তূপ থেকে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে উন্নয়নের মহাসড়কে টেনে এনেছিলেন। মাত্র সড়ে তিন বছরেই ৬ বিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিকে ১৯ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করেছিলেন।

কিন্তু স্বাধীনতা-বিরোধীদের ষড়যন্ত্রের ফলে বিশ্বাসঘাতকদের আঘাতে এই আগস্টের কালরাতে আমরা জাতির পিতাকে হারাই। এর কিছু দিন পর তাঁর সহনেতাদের জেলে খুন করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষশক্তিকে ধ্বংস করার অংশ হিসেবেই চলে এ আক্রমণ। এরপর থেকে স্বদেশ চলতে থাকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ঠিক উল্টো দিকে। তবে মানুষ বসে ছিল না। বঙ্গবন্ধু শহীদ হওয়ার পর থেকেই জেল-জুলুম উপেক্ষা করে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষশক্তি প্রতিবাদ প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সে প্রতিবাদের ধারাকে আরও শক্তিশালী করে। জাতির জনকের যোগ্য উত্তরসূরি বঙ্গবন্ধুকন্যা শুধু দল নয়, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শক্তিকে সমাবেশ করে সোনার বাংলার স্বপ্ন ফের দেশবাসির মন উজ্জীবিত করতে থাকেন। সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের সম্মিলিত শক্তির ওপর নির্ভর করে তিনি এক আশাজাগানিয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ভিত্তি তৈরি করেন। এ পথ মোটেও মসৃণ ছিল না। কবিরা অন্তর্যামী।

তাই নির্মলেন্দু গুণ লিখেছেন যে, তাঁর 'পথে পথে পাথর' বিছানো ছিল। তবু তিনিই ছিলেন আমাদের স্বপ্নের একমাত্র কাণ্ডারি। কবির নিজের ভাষায়-

'আপনার প্রত্যাবর্তন আজও শেষ হয়নি।
বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সিঁড়িতে
আপনি পা রেখেছেন মাত্র
আপনার পথে পথে পাথর ছড়ানো
পাড়ি দিতে হবে দুর্গম গিরি, কান্তার ও মরুপথ।'

আমাদের আরেক কবি সৈয়দ শামসুল হক একবুক প্রত্যাশা নিয়ে বঙ্গবন্ধুকন্যার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন-

'সেই বৃষ্টি সেই অশ্রু আপনার সেই ফিরে আসা নিমজ্জিত নৌকোটিকে রক্ত থেকে টেনে তুলবেন, মানুষের দেশে ফের মানুষের সংসার দেবেন ফিরেছেন বুকে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাশা।'

('শেখ হাসিনার জন্মদিনে', ২০০৯)

আমাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি শামসুর রাহমান তাঁর 'ইন্দ্রেস্টার পান' কবিতায় বঙ্গবন্ধুবিহীন বাংলাদেশে তার এবং বঙ্গবন্ধুর দুহিতার কষ্টের কথা তুলে ধরেছেন এভাবে-

'আড়ালে বিলাপ করি একা একা, ক্ষতার্ত পিতা
তোমার জন্য প্রকাশ্যে শোক করাটাও অপরাধ।
এমন কি, হায়, আমার সকল স্বপ্নেও তুমি
নিষিদ্ধ আজ; তোমার দুহিতা একি গুরুভার বয়!
নিহত জনক, এ্যাগামেমনন্, কবরে শায়িত আজ।'

কবির এই কষ্টের চেয়ে শতগুন বেশি কষ্টে আছেন বঙ্গবন্ধুকন্যারা। তা সত্ত্বেও ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি হিসেবে বঙ্গবন্ধুকন্যা ফিরে এসেছিলেন 'বৃষ্টিভেজা বৈশাখে'র এক দিনে। এর পরের ইতিহাস আমাদের সবারই জানা। কবি-সাহিত্যিক-শ্রমিক-কৃষক-তরুণসহ বঙ্গবন্ধুপ্রেমী সব মানুষের স্বপ্ন ও ভরসার কেন্দ্রে চলে আসেন তিনি। অনেক চড়াই-উতরাইয়ের পর মৃত্যুর নানা ঝুঁকি মোকাবেলা করেই বঙ্গবন্ধুকন্যা দেশ পরিচালনার হাল ধরেন ১৯৯৬ সালে। বাঙালির মনোজগতে ফিরিয়ে আনেন বঙ্গবন্ধুকে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। বন্যা, ঝড়, রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতাসহ নানা প্রতিকূলতা ডিঙিয়ে তিনি বাংলাদেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের এক নয়া অভিযাত্রার সূচনা করেন। মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তির রেখে যাওয়া জঞ্জাল দূর করে তিনি কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নে বহুমাত্রিক কৌশল গ্রহণ করে দুঃখী মানুষের দুঃখ মোচনে অনেকটা পথ পাড়ি দেন। সবচেয়ে স্বস্তির বিষয় যে, তিনি বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের আইনের আওতায় আনার জন্য 'ইনডেমনিটি আইন অবলোপন করে ভরসার এক নয়া বাতাস বইয়ে দেন সমাজে। বিচার সম্পন্ন করলেও অপরাধীদের শাস্তি কার্যকরের আগেই আরেক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তাঁকে ২০০১ সালে ফের ক্ষমতায় আসতে দেওয়া হয় না। বাংলাদেশের শত্রুরা ঠিক বুঝে ফেলেছিল বঙ্গবন্ধুকন্যা ঠিকই সময় ও সুযোগ পেলে ফের মুক্তিযুদ্ধের শক্তিকে দেশ পরিচালনার মূল মঞ্চে নিয়ে আসবেন। আর বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের শূলে চড়াবেন। যুদ্ধাপরাধীদেরও বিচার শুরু করবেন। তাই তিনি যখন মানুষের প্রাণের এসব দাবি সামনে আনতে শুরু করেছিলেন ঠিক তখনই মরণ ছোবল মারে শত্রুরা। ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে ট্রাকের ওপর উঠে তিনি সন্ত্রাসবিরোধী এক প্রতিবাদ সমাবেশে সবে বক্তৃতা শেষ করেছেন। সময় তখন বিকাল ৫টা ২২ মিনিট। হঠাৎ আশপাশের ছাদ থেকে মুহুর্মুহু শব্দ করে গ্রেনেড হামলা। ঘটনাস্থলেই ১৮ আওয়ামী লীগ কর্মী ও নেতার প্রাণ যায়। পরে আরও আটজনের মৃত্যু হয়। পাঁচ শর মতো মানুষ আহত হয়। মহিলা আওয়ামী লীগ প্রধান আইভি রহমান এবং বিরোধী দলের নেতা শেখ হাসিনার দেহরক্ষী মাহবুবুর রহমানের প্রাণ যায়। সেদিন ঢাকার আকাশ-বাতাস আহতদের আর্তনাদে ভারী হয়ে উঠেছিল। প্রায় সব হাসপাতালেই শোনা যাচ্ছিল আহত ও নিহত মানুষের স্বজনের আহাজারি। বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রাণে বাঁচলেও তাঁর কানে আঘাত লাগে। নেতারা মানবঢাল তৈরি করে তাঁকে বাঁচান। পুরো আক্রমণের প্রধান টার্গেটই ছিলেন বঙ্গবন্ধুকন্যা। কেননা ততদিনে তিনি যে উদারনৈতিক বাংলাদেশের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য প্রতিভূতে পরিনত হয়ে গেছেন। শত্রুরা নিশ্চয় জানত তিনি যে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য যোগসূত্র। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আওয়ামী লীগের সব উর্ধ্বতন নেতাকে তারা শেষ করে দিতে চেয়েছিল। উদ্দেশ্য আর কোনো দিন যেন উদার গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ার উদ্যোগ কেউ না নিতে পারে। সেদিনের এ হামলার সঙ্গে যে তৎকালীন অনুদার সরকারি দলের নেতৃবৃন্দের হাত ছিল তা পরে অপরাধী মুফতি হান্নানই প্রকাশ করে দেয়। অথচ সে সময় 'জজ মিয়া' নাটক সাজিয়ে সরকার ও পুলিশের কর্তাব্যক্তিরা এক লজ্জাজনক উপাখ্যান তৈরির কি ব্যর্থ চেষ্টাই না করেছিলেন। বিচার বিভাগীয় তদন্তের নামে বিচারপতি জয়নাল আবেদিন বাংলাদেশের বিচার বিভাগের জন্য এক কলঙ্কজনক অধ্যায় রচনা করেন। ধন্যবাদ জানাই বাংলাদেশের অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের। তারা কঠোর পরিশ্রম করে পুরো 'জজ মিয়া' নাটকটির ফানুস ফুটো করে দিয়েছেন। পরবর্তী সময়ে নতুন করে পুলিশি অনুসন্ধানে অপরাধীদের চেহারা উন্মোচিত হয়েছে। আমাদের বিচার বিভাগও অনেক সাক্ষ্য-প্রমাণ ঘেঁটে তাদের সঠিক শাস্তিই দিয়েছে। তৎকালীন সরকারি দলের নেতা, পুলিশসহ সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিদের শাস্তি দেওয়া হয়েছে। ৩৮ জনকে দোষী সাব্যস্ত করে ১৯ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। ১৯ জনকে যাবজ্জীবন। অনেক কর্মকর্তাকেও জেল দেওয়া হয়েছে। এখনো ১৮ আসামি পলাতক। তবে এ রায়ের মাধ্যমে যে বিষয়টি পরিষ্কার হয়েছে তা হলো, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এ হামলা পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকাশ্য দিবালোকে যুদ্ধে ব্যবহৃত হয় যে আর্জেস গ্রেনেড সেসব ছোড়া হয়েছে রাষ্ট্রের সহায়তায়। আক্রমণের মূল টার্গেট ছিলেন শেখ হাসিনা।

আমাদের ভাগ্য ভালো যে, বিধাতার অশেষ দয়ায় বঙ্গবন্ধুকন্যা ওই মৃত্যুপুরী থেকে সশরীরে ফিরে আসতে পেরেছিলেন। আর ফিরে আসতে পেরেছিলেন বলেই পরবর্তী পর্যায়ে সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, জেল-জুলুম সহ্য করে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনে বিপুলভাবে বিজয়ী হয়ে ২০০৯ সালের শুরুতেই দেশ পরিচালনার দায়িত্বভার নিতে পেরেছিলেন। আর 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার অঙ্গীকার নিয়ে

যে উন্নয়ন অভিযাত্রা শুরু করেছিলেন তার সুফল দেশবাসী এর মধ্যে পেতে শুরু করেছে। কল্পনা করুন যদি ডিজিটাল প্রশাসন ও আর্থিক ব্যবস্থা চালু না হতো তাহলে কোভিড কালে এদেশে ব্যবসা-বানিজ্য, সামাজিক সুরক্ষা, গার্মেন্টস কর্মীদের বেতন এবং সবাইকে টিকা প্রদানসহ প্রশাসনিক যোগাযোগ কি করে সম্ভব হতো? কিভাবেই বা এই মহাসংকট তথা অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয় থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করা যেতো? ডিজিটাল আর্থিক সেবার ফলে আজকাল কত কম খরচে কম সময়ে বাংলাদেশের ভোক্তা এবং উদ্যোক্তারা তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছেন তা কি কেউ গভীরভাবে ভেবেছেন? অন্যদিকে নানা প্রতিকূলতা ডিঙিয়ে বঙ্গবন্ধু হত্যাকারী অনেকের বিচারের রায় তিনি কার্যকর করেছেন। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পন্ন করে অনেকের বিচারের রায় কার্যকর করতে পেরেছেন। দেশে মহামারী ও বন্যা সত্ত্বেও উন্নয়নের অনেক সূচকে দক্ষিণ এশিয়ার 'মিরাকল' হিসেবে বাংলাদেশের নাম উঠে এসেছে। এমন বিপর্যস্ত সময়ে পৃথিবীর সবচেয়ে বাড়ন্ত দেশটির নাম বাংলাদেশ। জীবনের আয়ু, জন্মহার, শিশুমৃত্যু রোধ, সাক্ষরতার হার, সঞ্চয়ের হার, প্রবৃদ্ধির হার- সব সূচকেই দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সবচেয়ে উজ্জ্বল দেশটির নাম বাংলাদেশ।

সম্প্রতি টাইমস অব ইন্ডিয়া ১৪টি উন্নয়ন সূচকের ভিত্তিতে বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানে জনগণের জীবনমানের তুলনামূলক চিত্র নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে যে, ১৪টি সূচকের মধ্যে ৭টিতেই বাংলাদেশ ভারতকে পেছনে ফেলেছে, পাকিস্তানকে পেছনে ফেলেছে ১৩টিতে। বিশেষ করে শিশুমৃত্যু রোধ, শিশুদের বেড়ে ওঠার নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিতকরণ এবং গড় আয়ুর মতো মানব উন্নয়ন সূচকগুলোয় প্রতিবেশী অন্য দুটো দেশের তুলনায় এগিয়ে থাকাটা আমাদের মানবিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ননীতির সফল বাস্তবায়নের প্রমাণ। বাংলাদেশে প্রতি হাজার সদ্যোজাত শিশুর মধ্যে মৃত্যুহার মাত্র ২২, যেখানে ভারতের ক্ষেত্রে এ অনুপাত ৩০ আর পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ৫৭।

এ ছাড়া সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকের অনেকটিতে বাংলাদেশ তিনটি দেশের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে। কোভিড এবং ইউক্রেন যুদ্ধ না হলে বাংলাদেশ আরও অনেকটা পথ এগিয়ে যেতো তা সত্ত্বেও গড় সঞ্চয় জিডিপির বিচারে বাংলাদেশ পাশের ভারত ও পাকিস্তানকে পেছনে রেখেছে। যে পাকিস্তানের থাবা থেকে বহু সংগ্রামের পর বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, স্বাধীনতার ৩৫ বছরের মধ্যেই সেই পাকিস্তানকে প্রবৃদ্ধির হারের বিচারে অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছিল এবং এর পর থেকে টেকসই সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতির অংশগ্রহণমূলক বাস্তবায়ন করা গেছে বলেই বাংলাদেশের গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধি পাকিস্তানের চেয়ে ২.৫ শতাংশ বেশি হয়েছে। ২০১৯ সালে এসে বাংলাদেশের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় জিডিপির অধিকারী দেশ ভারতকেও ছাড়িয়ে যায়। এখনও প্রবৃদ্ধির এই ধারা অব্যাহত রয়েছে। সামাজিক উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ এখনও এক ব্যতিক্রমী দেশ হিসেবে বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেছে। নিঃসন্দেহে বাংলাদেশে বেকারত্ব ও দারিদ্র্যের চ্যালেঞ্জ রয়েছে, দুর্নীতি এখনো প্রকট, শাসন-ব্যবস্থায় যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। আর কতিপয় 'অতিধনী' লোভী ব্যবসায়ীদের কারণে প্রায়ই বাংলাদেশের এই সাফল্যের গল্প হোঁচট খেতে হয়। আর এর সুযোগ নিয়ে দেশি বিদেশী স্বার্থান্বেষী মহল মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ এবং তার কাণ্ডারীকে যখন তখন আক্রমন করে থাকে।

তা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধুকন্যার বলিষ্ঠ নেতৃত্বের গুণে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেই বাংলাদেশ মানব উন্নয়নের শক্ত ভিত্তি এরই মধ্যে স্থাপন করে ফেলেছে। এর পুরো কৃতিত্ব বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনাকে দিতেই হবে। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট জীবিত অবস্থায় স্বগৃহে ফিরে আসতে পেরেছিলেন বলেই তো তিনি এ 'মিরাকল বাংলাদেশ'-এর নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। পথের পাথর পেরিয়েই তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক সেই প্রত্যাশাই করছি। তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

লেখক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর

বত্রিশ নম্বর
কামাল চৌধুরী

এই বাড়িটা জাতির পিতার, এই বাড়িটা সবার
এই বাড়িটা মুজিব নামে পলাশ, রক্তজবার
এই বাড়িটা অশ্রুলেখা শোকের অগস্ট মাস
এই বাড়িটা পিতৃভূমির কান্না, দীর্ঘশ্বাস

এই বাড়িটা পদ্মা-মেঘনা, মধুমতির জল
এই বাড়িতে চিরকালের সাহস অবিচল
মুক্তিদাতা উন্নত শির-দীর্ঘদেহী ভোর
এই বাড়িটা অন্ধকারে তাড়ায় ঘুমঘোর

এই বাড়িটা একত্তরে মুক্ত নীলাকাশ
হত্যাকারী, শত্রুসেনা, রাজাকারের ত্রাস
এই বাড়িটা সাহস দিলে আমরা জেগে থাকি
বাংলা মায়ের রক্তশপথ হাত উঁচিয়ে রাখি

এই বাড়িটা হাজার বছর পলিমাটির ক্রোধে
লালসবুজের মহিমাময় আত্মত্যাগী রোদে
এই বাড়িটা ধুলো-কাদা, বৃষ্টিভেজা মাটি
মহাকালের বটের ছায়ায় আমরা সবাই হাঁটি।

এই বাড়িতে মুজিব আছেন, জাতির বাতিঘর
রবি ঠাকুর, নজরুল তার প্রাণের কণ্ঠস্বর
এই বাড়িতে পাল উড়িয়ে মহামানব আসে
জয়বাংলার স্রোতের মুখে নৌকোখানি ভাসে

তর্জনীতে আকাশ কাঁপে, তর্জনীতে দেশ
এই বাড়িটা বজ্রকণ্ঠ–মুক্তি অনিঃশেষ
এই বাড়িটা স্বাধীনতা, রক্ত দিয়ে লেখা
এই বাড়িতে বিশ্বজনের মহাসাগর দেখা

তোমার জন্মদিন
ইসমত আরা পলি

এই শহরে আসলে তুমি খুললো নতুন দোর
তোমার জন্য মুক্ত বাতাস মুক্ত সকল ভোর।
আজকে তোমার জন্মদিনে দোয়েল শ্যামার হাসি
সবুজ মাঠে রাখাল ছেলে বাজায় উতাল বাঁশি।

স্বাধীন দেশে নারী যখন ছিল পরাধীন
তাদের কাছে তুলে দিলে আলোক ঝরা দিন।
দেশের জন্য তোমার আছে অদম্য সব সাধন
ফেললে ছিঁড়ে বঙ্গনারীর অসংখ্য সব বাঁধন।

দেশের জন্য ঝড়ছে তোমার হাজার রকম জল
তবু তুমি সামনে যেতে আছো অবিচল।
তোমার জন্য চারিদিকে দিকবিজয়ী ঢল
তোমার জন্য স্বদেশভূমি আনন্দে উচ্ছল।

তোমার হাতেই লক্ষ মানুষ খুঁজে পেল নীড়
ভালোবেসে দেখতে তোমায় করছে সবাই ভিড়।
এমনি তুমি যাও এগিয়ে তোমার স্বপ্নপুর
স্বপ্নপুরে আছে যেন আলোর সমুদ্দুর।

নিউ মিডিয়াঃ বাংলাদেশ বেতারের নতুন মহাসড়ক

নাসরুল্লাহ মোঃ ইরফান

পূর্বকথন

প্রাচীন, সহজলভ্য ও একটি শক্তিশালী গণমাধ্যম হিসেবে বেতার বিশ্বব্যাপী বহুল পরিচিত এবং অন্যান্য গণমাধ্যমের তুলনায় এর ব্যাপ্তিও অনেক বেশী। প্রাচীন কাল থেকেই তথ্য ও বিনোদনের মাধ্যমে শহর-নগর-গ্রামসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণের মধ্যে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, মৌলিক অধিকার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে বেতারের কোনো বিকল্প নেই। এছাড়াও, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী, জরুরি অবস্থাকালীন যোগাযোগ ও যেকোন বিপর্যয়ে জন-জীবনে বেতার যন্ত্রের ভূমিকা অপরিসীম।

ঢাকা কেন্দ্রিক বেতারের যাত্রা ১৯৩৯ এর ১৬ ডিসেম্বর শুরু হলেও বাংলাদেশ বেতারের যাত্রা শুরু হয়েছিলো মূলতঃ ১৯৭১ সালে ৭ই মার্চে রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ প্রচারের মাধ্যমে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ সরাসরি সম্প্রচারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। এর প্রতিবাদে বেতারের একদল দেশপ্রেমিক-সাহসী কর্মীবাহিনী সেদিন সকল অনুষ্ঠান সম্প্রচার বন্ধ করে দিয়েছিল। পরের দিন ৮ই মার্চ পাকিস্তানের ইয়াহিয়া সরকার বাধ্য হয় বঙ্গবন্ধুর সেই কালজয়ী ভাষণ বেতারে সম্প্রচার করতে। যা ছিল মুক্তিকামী বাঙালি জাতির জন্য এক বিরাট সাফল্য। ১৯৭১ এর ৭ই মার্চের কালজয়ী ভাষণ সম্প্রচার বেতারকে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করেছে। এরপর, ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রই পরবর্তীতে ১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বর নাম বদলে হয় বাংলাদেশ বেতার।

সেই থেকে স্বাধীনতা পরবর্তী বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রারম্ভিক সময়ে বাংলাদেশ বেতার হয়ে উঠে সদ্য স্বাধীন দেশের জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য তথ্য ও বিনোদন প্রাপ্তির এক পরম নির্ভরতার স্থল। দেশ পুনর্গঠনের প্রতিটি স্তরে বেতারের ভূমিকা ছিল সরব। আবহমান বাংলার ইতিহাস-ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতির লালন ও বিকাশ এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে শিল্পী-কলাকুশলী অন্বেষণে বাংলাদেশ বেতারের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। দেশের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড প্রচার, শিক্ষা, কৃষি, জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য, নারীর ক্ষমতায়ন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, জনপদের মৌলিক অধিকার এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উৎকর্ষ সাধনে সৃষ্টির শুরু থেকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে বেতার। বাংলাদেশ বেতার থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রচারিত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর সকল কালজয়ী ভাষণ, যা আজও ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে এবং বেতারের আর্কাইভে সযত্নে সংরক্ষিত রয়েছে, যা বাঙালি জাতির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অমূল্য সম্পদ।

এছাড়াও, প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রায় শতকরা ৯৮ ভাগ কাভারেজ এরিয়া নিয়ে বাংলাদেশ বেতারের অনুষ্ঠান ও সংবাদ প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনমানুষের তথ্য, শিক্ষা ও বিনোদনের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উৎস ছিল। প্রাকৃতিক দুর্যোগে, বিভিন্ন জরুরী পরিস্থিতিতে কিংবা

কোভিড-১৯-এর মতো মহামারীতে বেতারের নিরলস কর্মীবাহিনী জরুরি তথ্যসেবা প্রদান করে সবসময়ই সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে, বার বার প্রমাণ করেছে "বেতার সবার জন্য, সবসময়, সবখানে"।

বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গৃহীত বিভিন্ন প্রেক্ষিত পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বেতার নিয়মিত ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, রূপকল্প-২০৪১, ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮ বাস্তবায়ন, বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগ, সরকারের মেগা প্রজেক্ট ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডসহ বিনোদনমূলক নাটক ও গান এবং প্রতি ঘন্টায় ঘন্টায় জাতীয় ও স্থানীয় সংবাদ প্রচার করে জনগণকে তথ্য প্রদান ও জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বাংলাদেশ বেতার। বাংলাদেশকে একটি উন্নয়নশীল দেশে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের অক্লান্ত পরিশ্রমের একনিষ্ঠ সহযোগী বাংলাদেশ বেতার।

দীর্ঘ পথপরিক্রমায় বাংলাদেশ বেতারের অর্জনের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক বহু সম্মাননা ও পুরস্কার। ২০০৬ সালে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে বিশেষ অবদান রাখার জন্য বাংলাদেশ বেতারকে দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা পদক "স্বাধীনতা পদক" প্রদান করা হয়, ২০১৭ সালে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৭১ সালের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের কালজয়ী ভাষণকে বিশ্বের প্রামাণ্য ঐতিহ্যের দলিল হিসেবে অনন্য স্বীকৃতির অন্যতম অংশীদার বাংলাদেশ বেতারকে UNESCO কর্তৃক বিশেষ সম্মাননা সনদ প্রান করা হয়, কোভিড-১৯ সংক্রমণ রোধে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ বিষয়ক অনুষ্ঠান ও তথ্য প্রচার করে UNICEF থেকে Best Covid-19 Responder Award 2020 এবং Best Radio Listener Facilitator Award 2021 অর্জন করে বাংলাদেশ বেতার। এছাড়াও, ঐতিহ্যমন্ডিত এই বেতার দেশে-বিদেশে প্রায় অর্ধশতাধিক পুরস্কার অর্জন করেছে, যা দেশের কোটি কোটি শ্রোতার ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ।

একবিংশ শতাব্দীতে তথ্য প্রযুক্তির নানা উৎকর্ষের সাথে সাথে দেশী-বিদেশী অডিও ও ভিজুয়্যাল মিডিয়ার প্রসার, ও বেতারযন্ত্রের অপ্রতুলতার কারণে নাগরিক ব্যস্ত জীবনে বেতারযন্ত্রের উপর পূর্বের সেই নির্ভরতা অনেকাংশেই কমে এসেছে, যার ফলে অস্তিত্ব নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে বাংলাদেশ বেতার। অত্যন্ত জনপ্রিয় এই মাধ্যমটি শ্রোতার এবং যুগের চাহিদামতো নানা ধরণের অনুষ্ঠান নিয়মিত প্রচার করে গেলেও বর্তমানে ইন্টারনেট ও স্মার্ট ফোনের যুগে প্রচলিত তরঙ্গ সম্প্রচারের মাধ্যমে শ্রোতার সম্পূর্ণ আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হতে পারছে না। বাংলাদেশ বেতারের গিয়াজো ও শ্রোতা গবেষণা শাখা কর্তৃক কৃত শ্রোতা জরিপের প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, ২০২১-২২ অর্থবছরের তুলনায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রচলিত মাধ্যমে শ্রোতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত ফিডব্যাক প্রায় ২২% হ্রাস পেয়েছে, যা থেকে ফুটে ওঠে বেতারের সংকটের একটি ক্ষুদ্র চিত্র।

ফিডব্যাকের মাধ্যম	২০২১-২২	২০২২-২৩	মন্তব্য
চিঠি	৭৫,০৩৩	৭৩,২২২	হ্রাস পেয়েছে
ই-মেইল	১,৫৬,৪৪১	১,৪৮,৫৪২	হ্রাস পেয়েছে
ফোন	৫৩,৬০৫	৬৬,০৫৮	বৃদ্ধি পেয়েছে
এসএমএস	১,৯৩,২৭৭	১,৪০,৯৮১	হ্রাস পেয়েছে
মোট	৫,৫৫,৫৮৫	৪,৩৫,০২৪	হ্রাস পেয়েছে

এমনই এক যুগসন্ধিতে বাংলাদেশ বেতারের হারিয়ে যাওয়া গৌরব পুনরায় ফিরিয়ে আনার এবং দেশের আনাচে-কানাচে পৌঁছে দেয়ার জন্য বিভিন্ন সময় নেয়া হয় নানা উদ্যোগ। এরই অংশ হিসেবে তরঙ্গ সম্প্রচারের পাশাপাশি ওয়েবসাইটে অনলাইন স্ট্রিমিং, মোবাইল অ্যাপ তৈরি, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেইসবুক পেইজ ও ইউটিউবের মাধ্যমে বেতারকে শ্রোতার কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার জন্য গ্রহণ করা হয় নানা কার্যক্রম। তবে তা ছিলো বিক্ষিপ্ত ও ব্যক্তি উদ্যোগ পর্যায়ে।

বেতার সম্প্রচারকে আধুনিক এবং দেশ ও বহির্বিশ্বে শ্রোতাদের কাছে সহজলভ্য সর্বোপরি স্মার্ট করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রয়াসগুলোকে আনুষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার পর আঞ্চলিক কেন্দ্র ও ইউনিটসমূহের অনুষ্ঠান ও বার্তা শাখার ৩৬টি ফেইসবুক পেইজ ও ৩৪টি ইউটিউব চ্যানেলকে কার্যকরভাবে শ্রোতাদের হাতের মুঠোয় পৌঁছে দেয়ার গ্রহণ করা হয়েছে "সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলাদেশ বেতার: স্মার্ট বাংলাদেশ" উদ্যোগটি । তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও সম্মানিত সচিব বাংলাদেশ বেতারের আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেছেন। তাঁদের দিক-নির্দেশনায় ও সময়োপযোগী উদ্যোগের ফলে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে স্মার্ট প্লাটফর্মে বাংলাদেশ বেতারের নিউমিডিয়া কার্যক্রমটি শুরু করা সম্ভব হয়েছে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের বিবর্তলের ধারায় নিউমিডিয়া/ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে শ্রোতার চাহিদা অনুসারে বেতার অনুষ্ঠান প্রচারের ফলে অডিও কন্টেন্টের পাশাপাশি মানসম্পন্ন প্রচারণামূলক অডিও-ভিজ্যুয়াল অনুষ্ঠান নির্মাণ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শ্রোতাদেরকে বেতারের অনুষ্ঠানের সাথে আরো সম্পৃক্ত করা সম্ভব হবে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে বেতার অনুষ্ঠানকে শ্রোতার দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে নাগরিক সেবার মান উন্নয়ন করাও সম্ভব হবে। এর ফলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রূপকল্প ২০৪১-এর স্মার্ট বাংলাদেশের স্মার্ট গভর্নমেন্ট বাস্তবায়ন ও স্মার্ট সিটিজেন গঠনে সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করবে বাংলাদেশ বেতার।

এ উদ্যোগের উদ্দেশ্য

১. বাংলাদেশ বেতারের অনুষ্ঠান ও সংবাদ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করে জনগণকে স্মার্ট প্লাটফর্মে তথ্য সেবা প্রদান।
২. সরকারের প্রেক্ষিত পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বেতার থেকে প্রচারিত বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ, সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগ, সরকারের মেগা প্রজেক্ট ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ও কর্মসূচী বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিষয়ে তথ্য ও প্রযুক্তির মাধ্যমে জনগণকে সহজেই অবহিত, সম্পৃক্ত ও দেশসেবায় উদ্বুদ্ধকরণ সম্ভব হবে।
৩. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে নাগরিক সেবার মান উন্নয়নের মাধ্যমে স্মার্ট গভর্নমেন্ট বাস্তবায়ন।
৪. সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে সরকারের স্মার্ট সম্প্রচার কার্যক্রমের মাধ্যমে স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট গভর্নমেন্ট, স্মার্ট ইকোনমি ও স্মার্ট সোসাইটি গঠন করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রূপকল্প-২০৪১-এর স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা।

যা করা হয়েছে

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের এ সন্ধিক্ষণে বাংলাদেশ বেতার আধুনিক প্রযুক্তিকে ধারণ করে এগিয়ে চলছে। জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দিকনির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে ২০৪১ সালের মধ্যে 'স্মার্ট বাংলাদেশ'-এ রূপান্তরের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বেতারও সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে ডিজিটাল ও স্মার্ট প্রযুক্তি গ্রহণ করছে। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের পথে বেতার সম্প্রচারকে আরও সহজলভ্য করতে অনুষ্ঠান ও বার্তা শাখার ৩৬টি ফেইসবুক পেইজ ও ৩৪টি ইউটিউব চ্যানেল এক প্লাটফর্মে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

অত্যন্ত জনপ্রিয় মাধ্যমটি শ্রোতার এবং যুগের চাহিদামতো প্রতিদিন নানাধরণের অনুষ্ঠান নিয়মিত প্রচার করে যাচ্ছে। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের দিক-নির্দেশনায় ও বাংলাদেশ বেতারে আমার নিবেদিতপ্রাণ কিছু কর্মোদ্যমী কর্মকর্তার তৎপরতায় "সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলাদেশ বেতার: স্মার্ট বাংলাদেশ" কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

বাংলাদেশ বেতারের সবকটি কেন্দ্র ও ইউনিটের অনুষ্ঠান ও বার্তা সম্প্রচার সোশ্যাল মিডিয়া নিউ মিডিয়াকে ধারণ করে দর্শক-শ্রোতার কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। এ উদ্যোগের ফলে বেতারের অনুষ্ঠান এখন শোনা ও দেখা যাচ্ছে ফেইসবুক ও ইউটিউবে। ফলে বেতারের জনপ্রিয়তাও আশানুরূপভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ফেইসবুক ও ইউটিউবে অনুষ্ঠান আপলোড করার কারণে শ্রোতারা তাঁদের সুবিধামতো সময়ে শুনতে পারছেন পছন্দের অনুষ্ঠান। নিজস্ব সম্প্রচার যন্ত্রের পাশাপাশি প্রতিটি কেন্দ্র ও ইউনিটের ফেইসবুক পেইজ ও ইউটিউব চ্যানেলে সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বিষয়ক অনুষ্ঠান ও সরাসরি সম্প্রচারকৃত বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠানে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত ভাষণসমূহ একযোগে সরাসরি প্রচারিত হওয়ায় তাঁদের দিক-নির্দেশনা দেশবাসীর কাছে মুহূর্তেই পৌঁছে যাচ্ছে যা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে অত্যন্ত কার্যকর ও সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

এর যত সুফল

➢ "সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলাদেশ বেতার: স্মার্ট বাংলাদেশ" উদ্যোগটির ফলে দেশের আপামর জনগণের জীবনমান উন্নত হবে।
➢ এ উদ্যোগটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিলে বেতারে তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ে দক্ষ জনগণের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে
➢ বেতারের আঞ্চলিক কেন্দ্রে নিউ মিডিয়া সেল তৈরী করা হলে স্থানীয় জনগণ সরাসরি উপকৃত হবে ও স্থানীয়ভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।
➢ পৃথিবীর যে-কোন প্রান্ত থেকে শ্রোতা বা দর্শক তাঁর সময়ে অনুষ্ঠান দেখতে ও শুনতে পরবেন।
➢ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অন্যান্য প্লাটফর্ম ব্যবহার করে এ উদ্যোগটিকে সম্প্রসারণ করে শ্রোতাদেরকে বেতারের সাথে আরো সম্পৃক্ত করার সুযোগ রয়েছে। ফলে সময়ের সাথে বেতারের প্রযুক্তিগত অভিযোজন সক্ষমতা বাড়বে এবং অস্তিত্বের

সংকটে পড়বে না।

কার্যক্রমের প্রভাব

➢ এ উদ্যোগের ফলে বেতার থেকে সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানের জনপ্রিয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ বেতার রংপুর কেন্দ্রের ইউটিউব চ্যানেলে জনপ্রিয় "গাড়িয়াল বন্ধু" অনুষ্ঠানের একটি পর্বের এ'পর্যন্ত ভিউ ১৪ লক্ষ;

➢ শ্রোতারা তাঁদের সুবিধামতো সময়ে অনুষ্ঠান শুনতে পারছে;

➢ এর ফলে বাংলাদেশ বেতারের রাজস্ব আয়ের সম্ভাবনাও তৈরী হয়েছে

➢ উল্লেখ্য, বাংলাদেশ বেতারের পিয়ার্জো ও শ্রোতা গবেষণা শাখার জুন'২০২৩-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, বাংলাদেশ বেতারের অনুষ্ঠান ও বার্তা শাখার সকল আঞ্চলিক কেন্দ্র ও ইউনিটের ৩৬টি ফেইসবুক পেইজে বর্তমানে মোট ৫,৭৭,২৩৪ জন ফলোয়ার এবং ৩৪টি ইউটিউবে ৬৪,১৯০ জন সাবস্ক্রাইবারস রয়েছে। এছাড়াও, বাংলাদেশ বেতারের ওয়েবসাইট ও মোবাইল অ্যাপসে যুক্ত আছেন ৩৪,২২,৩২৯ জন শ্রোতা।

Current Status of New Media	
FB Followers	5,77,234
Youtube Subscribers	64,190
App/Website User	34,22,329
FB Likes	4,53,043
YouTube Views	88,10,974
YouTube Videos	7,310
Total Engagement	1,33,35,080

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সন্ধিক্ষণে বাংলাদেশ বেতার আধুনিক প্রযুক্তিকে ধারণ করে এগিয়ে চলছে। জাতির পিতার বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিক-নির্দেশনা, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সার্বিক তত্ত্বাবধানে এবং সম্মানিত সচিব-এর তদারকিতে সকল আঞ্চলিক কেন্দ্র ও ইউনিটের অনুষ্ঠান ও বার্তা সম্প্রচারকে সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্মে নিয়ে আসতে চেষ্টা করা হচ্ছে। পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্মে নতুন যে-সকল মাধ্যম যুক্ত হচ্ছে তার সাথেও বেতারকে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। বেতারের কিছু মেধাবী কর্মকর্তার উদ্ভাবনী চেতনা ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় বর্তমানে বাংলাদেশ বেতার শ্রোতার পাশাপাশি দর্শকদের কাছেও আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে শ্রোতাদের সাথে কার্যকরী মিথস্ক্রিয়া তৈরি করতে সকলে সার্বক্ষণিকভাবে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। এর ফলে ২০৪১ সালের মধ্যে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণে বাংলাদেশ বেতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে বলে আমি আশাবাদী।

লেখক: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার

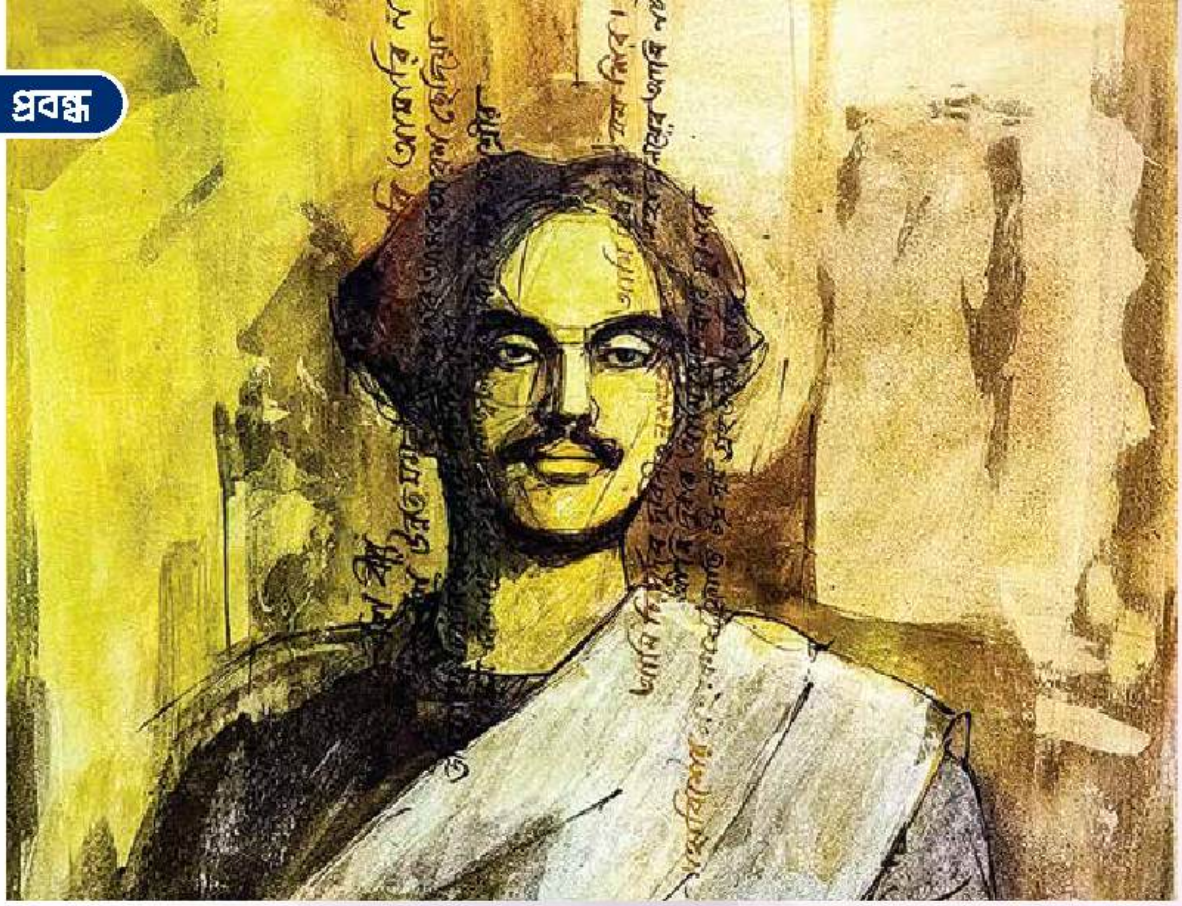

নজরুল কাব্যের জনপ্রিয়তা ও অপরাপর কাব্যসত্য

মোহাম্মদ আজম

নজরুল-কাব্যের জনপ্রিয়তা সেকালের পাঠকদের জন্য এক অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতা। এক কবিতা একাধিক পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হচ্ছে, চায়ের দোকানে কাড়াকাড়ি করে লোকে কবিতা পড়ছে, আগাম টাকা দিয়ে সম্পাদকরা কবিতা নিয়ে যাচ্ছে, একের পর এক কাব্যগ্রন্থ বাজেয়াপ্ত হয়ে যাচ্ছে, কয়েকটি পত্রিকা দাঁড়িয়ে যাচ্ছে নজরুলের লেখায় ভর করে – এসব অতি-নতুন অভিজ্ঞতাই অস্বস্তির কারণ। উপনিবেশিত বাঙালি অভিজাতদের সংকীর্ণ নন্দনভাবনায় আমজনতার কোনো পরিসর ছিল না। শিক্ষিতরা শিখবে আর শিক্ষিতরাই পড়বে – এই ছিল দস্তুর। পুরনো বাংলা কবিতার অভিজ্ঞতা ছিল একেবারেই অন্যরকম। এমনকি উর্দু বা হিন্দি সাহিত্যেও আধুনিক বাংলা কবিতার মতো জনবিচ্ছিন্নতা দেখা যায়নি। স্পষ্টতই কলকাতাকেন্দ্রিক ঔপনিবেশিক সমাজের শ্রেণিগত সংকীর্ণতাই এ বাস্তবতার প্রধান উৎস। ওই উপনিবেশিত সমাজে আরেকটি ঘটনা ঘটেছিল। ঈশ্বরগুপ্তের পর কবিতায় আর প্যারীচাঁদ মিত্রের পর গল্প-উপন্যাসে সমকাল পুরোপুরি বাদ পড়েছিল। মিথ, রোমান্স আর প্রাচীন ভারতই ছিল ভরসা। উপনিবেশের সমাজে এ দুই রোগ এত ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল যে, অসহযোগ আন্দোলনের মতো প্রবল আলোড়নে কোনোভাবে সাড়া দিয়েছে এমন এক নজরুল ছাড়া আর কোনো সাহিত্যিক-প্রতিনিধি শনাক্ত করা যায় না। তাহলে বিদ্যমান বাস্তবতায় নজরুল দুটি নতুন মাত্রা যোগ করলেন। জাতীয়-রাজনৈতিক বা অপরাপর বাস্তবকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা দিলেন; আর প্রথমে কবিতা ও প্রবন্ধ এবং পরে গান হয়ে পৌঁছে গেলেন আমজনতার দরবারে।

পৌঁছাতে পারলেন কেন? হুমায়ুন কবিরের মতে, বাংলার বিপুল কৃষকসমাজের সাথে ছিল নজরুলের গভীর আত্মীয়তা। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও বলেছেন, নজরুল কৃষক পরিবারের সন্তান; সেকারণেই তাঁর রচনা এত দ্রুত জনসমাজকে আচ্ছন্ন করতে পেরেছে। জনসমাজে গৃহীত হওয়ার একটা কারণ তাঁর রাজনীতি ও রাজনৈতিকতা। তিরিশের মেধাবী কবিরা যখন বিচ্ছিন্নতাবাদী কাব্যচর্চা করছিলেন, তখন ভারতীয় সমাজের মেধাবী অপরাংশ সংগঠিত হচ্ছিল ব্রিটিশবিরোধী লড়াইয়ে। তাদের সাথে জেগেছিল সাধারণ মানুষও। নজরুল এই অপরাংশের ভাব ও তৎপরতাকে ভাষা দিয়েছেন। ভুলে যাওয়ার উপায় নাই, ধূমকেতু পত্রিকাকে বিভিন্ন বিপ্লবীদল নিজেদের পত্রিকা মনে করত। নিশ্চয়ই তত্ত্ব বা অস্ত্রের জোগানের জন্য নয়; ওই ভাষার সম্মোহনেই।

উল্লেখ্য, সাংবাদিক-সম্পাদক নজরুল যথার্থ অর্থে অবমূল্যায়নের অন্ধকারেই রয়ে গেছেন। তাঁর জনপ্রিয়তার অন্যতম প্রধান কারণ কিন্তু সাংবাদিক গদ্য। এমন কার্যকর সাংবাদিকতার দ্বিতীয় কোনো নজির বাংলা অঞ্চলে দেখা যায়নি। নজরুল পত্রিকা প্রকাশ করেছেন, অথচ পাঠকসমাজে আলোড়ন জাগেনি বা শাসকপক্ষ তটস্থ হয়নি, এমন ঘটনা একবারও ঘটেনি। উচ্চারণের তীব্রতা আর কার্যকরতাই এর কারণ। এই তীব্র কার্যকর ভাষায় সমকালকে শিল্পিত করাই নজরুলের বৈপ্লবিক

সাহিত্যকীর্তি। জনপ্রিয়তারও উৎস।

মুজফ্ফর আহমদ লিখেছেন: 'আমাদের ভাষায় জোর নেই, সংগ্রামশীলতা নেই, এই ধারণা আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল ছিল বলেই আমরা স্লোগান দিতাম হিন্দুস্থানিতে। নজরুল ইসলামের অভ্যুদয়ের পর আমরা বুঝেছি যে, বাঙলা ভাষাও জোরালো, সংগ্রামশীল ও অসীম শক্তিশালিনী'। অর্থাৎ গীতিকাব্যিক মিষ্টি সাহিত্যিক বাংলাকে নিজের কাজের জন্য নজরুল বদলে নিয়েছিলেন। কী লিখেছেন তিনি এ নতুন ভাষায়? জুগিয়েছেন বীররস। এনেছেন গতি। হাহাকার আর বিক্ষোভকে বদলে নিয়েছেন কবিতার ভাষায়। এর প্রতিটি ক্ষেত্রেই নজরুল কেবল নতুন নন, অদ্যাবধি অনন্য। এর প্রতিটিই অনূদিত হয়েছে সুরে আর ছন্দে। ধ্বনির বিশিষ্ট দ্যোতনায় পরিপ্রান্ত হয়ে তাঁর কথারা 'বুঝে উঠার আগেই' সঞ্চারিত হয়েছিল বিপুল মানুষের চেতনায়। নজরুলের কবিতায় সমকাল রূপ পেয়েছে – এ কথাটি আংশিক সত্য মাত্র। বলা দরকার, তাঁর সফল রচনাগুলোতে সমকাল কয়েক ধাপে অনূদিত হয়ে প্রবেশ করেছে শিল্পভাষায়। অথচ বিদ্যমান সাহিত্যিক ভাষা আর চলতি ভাষাকে – তৎসম ও আরবি-ফারসির প্রাচুর্য সত্ত্বেও – তা লঙ্ঘন করেনি। এতগুলো নন্দনতাত্ত্বিক ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরেও সাহিত্যের ইতিহাসের বা সমালোচনা-সাহিত্যের মূলধারায় যে নজরুলকে আঁটানো যায়নি, তাতেই প্রমাণিত হয়, এই নন্দনতত্ত্ব ঘোরতরভাবে সংকীর্ণ।

কিন্তু পাঠকের জন্য তত্ত্বের প্রয়োজন হয়নি। স্বতঃস্ফূর্ত উপভোগ-প্রবণতাই যথেষ্ট ছিল। নজরুল-সাহিত্যের একটা বড় অংশ ব্যক্তিগত পাঠের বিষয় নয়, বরং সামষ্টিক ভোগ ও ব্যবহারের শিল্প। ব্যক্তিগত পাঠের সাহিত্য সাহিত্যের একটি ধরন মাত্র, এবং অবশ্যই প্রভাবশালী ও উপযোগী ধরন, যা বিকশিত হয়েছে শিল্পবিপ্লবোত্তর উৎপাদন-সম্পর্কের বিশেষ স্তরে। কিন্তু এর বাইরেও কবিতার আছে অসংখ্য ধরন, ব্যবহার ও উপযোগিতা – আছে মানুষকে জাগানোর দায়িত্ব, দশের কথা বলার ও শোনার দায়িত্ব, উৎসবাদি ও সামষ্টিক আয়োজনে ব্যবহৃত হবার বাস্তবতা। নজরুলের কবিতা সেই বাস্তবতার কবিতাও বটে। তিনি কাজ করেছেন সামষ্টিক মনস্তত্ত্ব নিয়ে; কবিতার উচ্চারণরীতিতে এনেছেন সেই বিশিষ্টতা, যার দৌলতে দশের কথা দশকে সহসাই স্পর্শ করে যায়। তাঁর কবিতা ও গানে যে কোরাসের প্রাবল্য, তা এই বাস্তবতার বাহ্য লক্ষণ মাত্র; আরো অসংখ্য আভ্যন্তর লক্ষণ থেকে দেখানো যাবে, তাঁর বহু রচনা 'ব্যক্তিগত সাহিত্যে'র নন্দনতত্ত্বের পরোয়া করে না।

নজরুলের কবিতায় সঙ্গীতধর্মের প্রাবল্যও বিশেষ মনোযোগের দাবিদার। তাঁর ধ্বনিময়তা, নিখুঁত অন্ত্যমিল আর সুরের সম্মোহন শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাথে কবিতার পুরনো সখ্যের কথাই মনে করিয়ে দেয়। ছাপাখানার আধিপত্যের মধ্যে শিল্পভোগের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের যে রূপান্তর ঘটেছে, অর্থাৎ, শ্রুতির পরিবর্তে যেভাবে দৃষ্টির প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছে, তার ইতিহাস মনে রাখলে পশ্চিমা কবিতায় চিত্রকল্পের প্রাধান্যের ব্যাপারটিও বোঝা যাবে, আর ভিন্ন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কান-নির্ভর কবিতার তাৎপর্যও আন্দাজ করা যাবে। তখন নজরুলের ধ্বনিক-সাঙ্গীতিক পরিচর্যাকে 'পদ্য' হিসাবে চিহ্নিত করলেই কাজ শেষ হয়ে যাবে না, গভীরতর অন্য নন্দনসূত্রেও পরীক্ষা করে দেখতে হবে। আগের অনুচ্ছেদে আমরা ব্যক্তিগত সাহিত্যের বিপরীত যে বাস্তবতার কথা বলেছি, তার সাথে এই সাঙ্গীতিকতার নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান।

নজরুল এক বিশেষ অর্থে বাস্তববাদী কবি। বাস্তব ঘটনা নিয়ে কবিতা লিখেছেন বলেই নয়; বরং তাঁর দেখার প্রক্রিয়ার মধ্যেই বাস্তবতার এই বিশিষ্টতা সক্রিয় ছিল। তাঁর শাসনহীন ইন্দ্রিয়বৃত্তি, প্রগলভ প্রেম আর দার্শনিক আবেষ্টনীমুক্ত সৌন্দর্য ও প্রকৃতি-অনুধ্যান এই বাস্তবতারই বহিঃপ্রকাশ। কোনো পূর্বপরিকল্পিত দৃষ্টি নিয়ে তিনি চারপাশে তাকাননি। কল্যাণের অস্পষ্টভাবে নিরূপিত এক মূর্তি তাঁর মনে ছিল; সেটাই স্থির করে দিয়েছে তাঁর শত্রু-মিত্র। সেই অনিরূপিত মূর্তি থেকে তিনি অবরোহ পন্থায় নিচে নেমেছেন, আর মাটির পৃথিবীতে প্রাত্যহিক দিনযাপনের অভিজ্ঞতা থেকে উপাদান সংগ্রহ করে আরোহ পদ্ধতিতে উঠেছেন উপরে। এ কারণেই তাঁর কবিতা একেবারে মাটিতে থাকেনি, তবে সবসময় মাটির কাছাকাছি ছিল।

নজরুল-সাহিত্যের একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল, মানুষের ধ্রুপদী অভিজ্ঞতাকে বাণীরূপ দেয়া। এ ধরনের বাণী জনগোষ্ঠী অনন্তকাল ব্যবহার করতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক্ষেত্রে অতুলনীয়। সারা দুনিয়াতেই অনন্য। সাধারণত জাতির গঠনকালে সেই সাহিত্যিক জন্মান, যিনি সামষ্টিক আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ভাষা দেবেন, অভিজ্ঞতার নির্যাস আকারে রচনা করবেন সেই প্রবাদপ্রতিম পঙ্‌ক্তিগুচ্ছ, যেগুলো ব্যবহৃত হবে যুগ যুগ ধরে। বাঙালি জনগোষ্ঠীর বিশেষ জাগরণকালে নজরুল 'জাগরণের কবি' হিসাবে বা 'যুগ-প্রবর্তক' কবি হিসাবে এ দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তাঁর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা বিশেষভাবে ঘটেছে গানে। উদ্দীপনা বা জাগরণমূলক বাণীর সন্ধানে তাঁর কাছে যেতে হয়। অনুষ্ঠান বা উৎসবের আমেজ তৈরি হয় নজরুলের স্বরে-সুরে। ব্যক্তিগত বা সামষ্টিক ভক্তি প্রকাশের জন্য তাঁর রচনা বিকল্পহীন। একটা বিরাট জনগোষ্ঠীর ব্যক্তিগত আর সামষ্টিক প্রাত্যহিকতায় এমন অবিকল্প প্রতিষ্ঠা – একজন কবির এরচেয়ে পরম প্রাপ্তি আর কী হতে পারে?

তবে জনসাধারণের কবিতাপাঠ আর সাহিত্যের ইতিহাসে স্বীকৃতি – এ দুইয়ের মিলমিশ সবসময় হয় না। যেমন, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বা বিষ্ণু দে সাধারণ পাঠক-পরিসরে প্রায় অচেনা হলেও বাংলা কাব্যের ইতিহাসে বেশ প্রভাবশালী। নজরুলের ক্ষেত্রে প্রায় বিপরীতধর্মী ঘটনা ঘটেছে বলেই মনে হয়। সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক পরিসরে ব্যাপক উপস্থিতি সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যের প্রভাবশালী ইতিহাসধারায় নজরুল খানিকটা উপেক্ষিত হয়েছেন। তার মানে অবশ্য এ নয়, নজরুল আড়ালে থেকেছেন, বা তাঁকে নিয়ে আলোচনা ও লেখালেখির পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কম। মোটেই তা নয়। নজরুলকে নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে গ্রন্থের পর গ্রন্থ; ব্যাপকভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে তাঁর জীবন ও সাহিত্যকর্মের বিচিত্র তল। এ সব প্রকাশনা ও বিশ্লেষণের একটা অংশ সম্প্রদায়-বুদ্ধি তাড়িত। একটা অংশে রাষ্ট্রীয় ও প্রাতিষ্ঠানিক আনুকূল্যপুষ্ট। এগুলোও মূল্যবান; কারণ, এগুলো ধারণ করে আছে আমাদের জনচৈতন্য, সাংস্কৃতিক চেতনার অবস্থা ও মান। অন্যদিকে, নজরুল-চর্চার একটা বড় অংশে খুব সাহিত্যিক অর্থেই মূল্যবান। কিন্তু সেটা নজরুলকেন্দ্রিক আলাদা মূল্যায়ন ও বিবেচনা, ইতিহাসমূলক নয়। বিচ্ছিন্ন কিন্তু প্রভূত এসব পর্যালোচনায় কবি হিসাবে নজরুলের সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রকাশিত হতে দেখি এ মতের মধ্যে যে, বাংলা ভাষার প্রধান কবি চারজন: মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম ও জীবনানন্দ দাশ।

বলা দরকার, বাংলা কবিতার ইতিহাস ও সমালোচনা-সাহিত্যের প্রভাবশালী বলয়ে এ মতের কোনো প্রতিফলন পাওয়া যায় না। আমাদের একাডেমিক সমালোচনা ও সাহিত্যের ইতিহাসে নজরুলকে সাধারণত স্থাপন করা হয় রবীন্দ্রনাথ ও তিরিশি কবিদের মাঝখানে। তাঁর সাথে এক কাতারে নাম উচ্চারিত হয় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের। কিন্তু অসংখ্য নমুনা দিয়ে দেখানো যাবে, খুব কম ক্ষেত্রেই নজরুল, এমনকি এই সংকীর্ণ সীমার মধ্যেও, 'যথার্থ' মর্যাদা পান। সুকুমার সেন, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, দীপ্তি ত্রিপাঠী, অসুকুমার সিকদার প্রমুখের প্রভাবশালী সব গ্রন্থে নজরুল খুব গৌণভাবে উল্লেখিত হয়েছেন।

নজরুলকে ঘিরে একদিকে যেমন আছে অকারণ উচ্ছ্বাস, অন্যদিকে তেমনি আছে সচেতন-অচেতন নীরবতা। এর বোধ হয় সম্প্রদায়গত একটা হিসাব-নিকাশ আছে। তবে অন্য অনেক কিছুর মতো বিশুদ্ধ সম্প্রদায়গত প্রেক্ষাপট থেকে এ বিষয়েরও কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। বরং বাংলা ভাষার সাহিত্যিক বলয়ে প্রতিষ্ঠিত প্রভাবশালী নন্দনতত্ত্বের সাথে খাপ না-খাওয়াই প্রতিষ্ঠিত কেতায় নজরুল-পাঠের সংকট তৈরি করেছে – এরকম একটা সিদ্ধান্তের দিকে গেলেই তাঁর জনপ্রিয়তা ও উপেক্ষার ব্যাখ্যা যেমন পাওয়া যাবে, ঠিক তেমনি স্থান-কালের যে বিশিষ্ট বাস্তবতায় তাঁর উত্থান ও বিকাশ, তারও কাছাকাছি পৌঁছানো যাবে।

নজরুল যখন আবির্ভূত হয়েছিলেন কলকাতার সাহিত্যিক ময়দানে, তখন কলোনিয়াল মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠীর ক্ষয়ের যুগ চলছিল। কয়েক প্রজন্মের অভিজ্ঞতাপুষ্ট কলকাতার মধ্যবিত্ত নাগরিক সমাজ তার অস্তিত্বের গভীর থেকে উঠে আসা সৃষ্টিশীলতার ধরনে যেমন অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল, ঠিক তেমনি সেই সৃষ্টিশীলতার অনুকূলে তার নান্দনিক বোঝাপড়ার একটা কাঠামোও দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সমস্ত ঐতিহাসিক বিবরণী থেকে সংশয়হীনভাবে বলা যায়, কলকাতার এই নাগরিক সমাজ ছিল ঔপনিবেশিক শাসন ও সংশ্লিষ্ট আর্থিক কায়কারবার থেকে গড়ে ওঠা জনগোষ্ঠী, যাদেরকে ইংরেজি শিক্ষিত উচ্চবর্ণের হিন্দু হিসাবে মোটামুটি সন্তোষজনকভাবে বর্ণীকরণ করা যাবে। সার্বিক শিল্পচর্চার দিক থেকে এ জনগোষ্ঠীর গভীরতা ও বিস্তার ছিল ঈর্ষণীয়। প্রতিভাবান নজরুল খুব স্বাভাবিকভাবেই এ সাংস্কৃতিক বলয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন; আর অনায়াসেই এ ধারায় নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছেন। কিন্তু হলে কী হবে? জীবনযাপনের যে ভাষা তাঁর ব্যক্তিজীবন ও কাব্যজীবনের ভিত্তি, পূর্বোক্ত জনগোষ্ঠীর সাথে তার বিস্তর ফারাক। চুরুলিয়ার এক নিঃস্ব দরিদ্র মুসলমান পরিবারে জন্ম নেয়া এই কবি সব দিক থেকেই রবীন্দ্রনাথ-বর্ণিত 'মাটির কাছাকাছি' স্তরের মানুষ। একেবারে মৃত্তিকা-সংলগ্ন 'স্টক' থেকে উঠে আসা ভূমিজ পুরুষ। পরবর্তীকালে কলকাতায় গ্রামোফোন কোম্পানির দৌলতে কিছু সময়ের জন্য সচ্ছল জীবনযাপন করলেও ধর্ম-বর্ণ-পেশা-শিক্ষা-রুচি – কোনো দিক থেকেই নজরুল কলকাতার এলিট দলভুক্ত হতে পারেননি। তাঁকে স্নেহ করেছেন অনেকে; বিশেষত রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় ভাবুকরা তাঁর মধ্যে বিপুল সম্ভাবনা আবিষ্কার করে বাহবা দিয়েছেন; কিন্তু কলকাতার সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক কোনো প্রভাবশালী পোষ্ঠীতে নজরুল খিতু হননি বা হতে পারেননি।

আর তাঁর সাহিত্যকর্ম? হুমায়ুন কবির নজরুল-সাহিত্যের অন্তর্নিহিত প্রেরণা বিশ্লেষণ করেছেন এভাবে : এক. নজরুল অসহযোগ আন্দোলনের কবি; দুই. পুরনো পুঁথিসাহিত্যের ঐতিহ্যের মধ্যেই নজরুলের বিকাশ; তিন. বাংলার বিপুল কৃষক সম্প্রদায়ের সাথে তাঁর সহজ আত্মীয়তা। নজরুল কাব্যের এসব অন্তর্নিহিত বিশিষ্টতা কাব্যের ভাষায় অনূদিত হয়েছে সমকালের দুই প্রবল-প্রতাপ বাস্তবতাকে মান্য করে – ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন আর হিন্দু-মুসলমান যৌথতার এক আমূল জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষা। দুটিই নজরুলের কবিতার গুরুত্বপূর্ণ একাংশে বিপ্লবী আকাঙ্ক্ষার কাব্যরূপ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। নজরুলের জীবনচরিত ও কাব্যচরিত্রের এই গুরুতর বিশিষ্টতাই প্রমাণ করে, আধুনিক বাংলা কাব্যধারায় নজরুলকে আঁটিয়ে ফেলা মোটেই সহজ কর্ম নয়।

তার মানে অবশ্য এ নয়, নজরুল 'আধুনিক' বাংলা কাব্যে এক বিচ্ছিন্ন ঘটনা। মোটেই তা নয়। বরং 'আধুনিক' বাংলা কবিতার প্রচলিত ধারার সাথে সাযুজ্য রক্ষা করেই নজরুল তাঁর কবিভাষা তৈরি করে নিয়েছিলেন। নজরুলের কবিতার অন্য গুরুত্বপূর্ণ একাংশের উদাহরণ দিয়ে কথাটা ব্যাখ্যা করা যাক। প্রেম-প্রকৃতির মতো তুলনামূলক 'ঐতিহ্যবাহী' উপাদানের ক্ষেত্রেও নজরুল বস্তুত সমকালের প্রভাবশালী সীমা লঙ্ঘন করেছেন। কল্পনাপ্রবণ সুদূরতা এবং 'আদর্শ'ধর্মী বিষাদময়তার তুলনায় নজরুলের এ ধরনের কবিতায় অব্যবহিত অনুভূতির তীব্র প্রকাশ এবং ব্যক্তিসত্তার স্বরূপ উন্মোচনই মুখ্য। তা সত্ত্বেও এ ধরনের কবিতায় নজরুল 'মূলধারা'র কোনো আমূল ছেদ ঘটিয়েছেন বলা যাবে না। বড় কবিমাত্রেরই এরকম বিশিষ্টতা দেখা যায়। নজরুলের সার্বিক কল্যাণ-আকাঙ্ক্ষা কিংবা ব্যক্তি-ভজনাও প্রচলিত সীমার মধ্যেই পড়ে। এসব কারণে নজরুল-রচনার একটা বড় অংশ রবীন্দ্রবলয়ের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ না হলেও রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রভাব ও পৃষ্ঠপোষকতার বিকশিত সমালোচনার ভাষা এবং নন্দনতত্ত্বে নজরুল অচেনা গণ্য হননি। সমকালীন ও উত্তরকালীন বহু সমালোচক এক ধরনের ধারাবাহিকতার মধ্যেই নজরুলকে পাঠ করেছেন; করতে পেরেছেন।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ধারাক্রমের মধ্যে নজরুলকে জুতমতো আঁটাতে না পারলেও, কিংবা এ ধরনের আয়োজনের অভাব সত্ত্বেও, নজরুল বাংলা ভাষার অতি-আলোচিত সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বই বটে। এসব আলোচনায় সাধারণভাবে রবীন্দ্রনাথ ও তিরিশি কবিতার মূল অনুমানগুলোর ধারাবাহিকতার মধ্যেই নজরুলের কবিতা পঠিত হয়েছে। তাতে এই কাব্যলোকের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিশিষ্টতা জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রধান দিকগুলোকে এভাবে সূত্রায়িত করা যায়:

এক. সাধারণভাবে নজরুলকে চেনা হয় রোমান্টিক কবি হিসাবে। সেই রোমান্টিকতার এক পাশে বিদ্রোহ, অন্যদিকে প্রেম ও প্রকৃতি।

দুই. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর তিরিশি কবিদের মধ্যবর্তী জায়গায় তাঁর স্থান। আর এই স্থানে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার কিংবা যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের তুলনায় তাঁর গুরুত্ব অনেক বেশি।

তিন. বাংলা কবিতায় রবীন্দ্র-প্রভাব অতিক্রমে নজরুল খুব বড় ভূমিকা রেখেছেন 'অলস শব্দসুষমা'র বিপরীতে বীরত্বব্যঞ্জক গতি-প্রবাহ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে।

চার. নজরুল ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের কবি এবং 'ঔপনিবেশিক সমাজে সংগ্রামী

কবি'।

পাঁচ. নজরুল নিম্নশ্রেণির মানুষের প্রতি দরদি কবি-ব্যক্তিত্ব। বাংলা কবিতার সীমাকে তিনি এ দিক থেকে প্রসারিত করেছেন।

ছয়. নজরুল গভীরভাবে মানবতাবাদী কবি; তাঁর সমগ্র উচ্চারণ এবং কর্মপ্রবাহ এক গভীর মানবতাবোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত।

সাত. নজরুল বাংলা কাব্যের ধারায় একজন বড় কবি। বাংলা কবিতার শব্দমুদ্রায় ও ছন্দে তাঁর সুস্পষ্ট অবদান রয়েছে। তাঁর কাব্যস্বর পৃথক ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। উত্তরকালীন কবিতার অন্তত তিনটি প্রধান ধারায় – ইন্দ্রিয়জাপর উচ্চারণে, সাম্যবাদী-মার্কসবাদী কবিতায় এবং ইসলামচেতন কবিতায় – বিপুল প্রভাব তাঁর গুরুত্বকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

এই তালিকা আরো বাড়ানো যায়। তবে, সাধারণভাবে বাংলা কাব্যের ধারাবাহিকতার মধ্যে থেকে নজরুল-সাহিত্যকে যাঁরা ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন, তাঁদের আলোচনার প্রধান সূত্রগুলো এতে পাওয়া যাবে। সূত্রগুলো মূল্যবান; কারণ, এগুলোর ভিত্তিতে সহজেই দেখানো সম্ভব, নজরুল 'আধুনিক' বাংলা কবিতার অন্যতম প্রধান কবি।

কিন্তু, এই সূত্রগুলো নজরুল-বিবেচনায় পুরোপুরি যথার্থ নয়, যথেষ্ট তো নয়ই।

জাতীয়তাবাদী রাজনীতির প্রচণ্ড অভিঘাতেই বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে কলকাতাকেন্দ্রিক সংকীর্ণ মধ্যবিত্ত শ্রেণিটি তার সীমা প্রসারিত করার উদ্যোগ নিতে বাধ্য হয়। সেই সীমার মধ্যে আংশিকভাবে প্রবেশ করতে থাকে কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি জনতা, মুসলমান সম্প্রদায়, হিন্দু সম্প্রদায়ের অচ্ছুত অংশগুলো। রবীন্দ্রনাথ যে লিখেছেন – 'সে কবির লাগি কান পেতে আছি', তাঁর সে আকাঙ্ক্ষাটি আসলে নতুন রাজনৈতিক-সামাজিক বাস্তবতারই ফসল। কিন্তু শ্রেণি-অবস্থান ও সাংস্কৃতিক বলয়ের ঐতিহাসিক মেরুকরণের কারণে তাঁর নিজের পক্ষে সেই দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয়নি। নানা কারণে নজরুলের পক্ষে অন্তত অংশত এই কবির দায়িত্ব পালন সম্ভবপর হয়েছে।

তাঁর জন্মই তাঁকে স্থাপন করেছে এক সুবিধাজনক পাটাতনে। কাজী বংশে জন্মালেও তাঁর জন্মের সময় পরিবারটিকে গাঁয়ের আর দশটি চাষি পরিবার থেকে আলাদা করে দেখার উপায় ছিল না। পরেও কর্মসূত্রে, পত্রিকা সম্পাদনায়, সাহিত্যকর্মের বিশিষ্টতায় গণমানসের সাথে তাঁর সংযোগ খুব একটা বিচ্ছিন্ন হয়নি। উপনিবেশিত আধুনিকতার যেসব সাহিত্যকর্মকে আমরা বাংলা সাহিত্যের মূলধারা হিসাবে সম্মান জানিয়ে আসছি, সেগুলোর রচয়িতাদের সাথে তুলনা করে দেখলে নজরুলকে এক্ষেত্রে একেবারেই বিপরীত কোটিতে পাওয়া যাবে। নজরুলের সামগ্রিক বোধ-বিশ্বাস-কাব্যকলা-আগ্রহ-আবেগ-স্বপ্ন এই বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো ব্যাপার নয়। নজরুল যে একবার লিখেছিলেন, দারিদ্র্য তাঁকে মহান করেছে, তা কোনো আকস্মিক উচ্চারণ নয়, বরং তাঁর শিল্পীসত্তার মর্মমূলস্পর্শী সত্য।

জন্মসূত্রে পাওয়া আরেকটি সত্য তাঁর অনুকূলে কাজ করেছে। তা এই যে, তিনি জন্মেছিলেন মুসলমান পরিবারে। 'মুসলমান' শব্দটিকে এখানে আমরা সঙ্গত কারণেই ব্যবহার করতে চাই রাজনৈতিক বর্গ হিসাবে, আর নজরুলের সমকালের পরিপ্রেক্ষিতে শব্দটির দুটি তাৎপর্যে জোরারোপ করতে চাই। একটি হল তার শ্রেণি-তাৎপর্য, অন্যটি সাংস্কৃতিক তাৎপর্য। মুসলিম পরিবারে জন্ম নিয়ে শ্রেণির দিক থেকে নজরুল যুক্ত হয়েছেন শোষিত-বঞ্চিত এক বিশাল জনগোষ্ঠীর বাস্তবতার সাথে, আর আবশ্যিকভাবে হুমায়ুন কবির কথিত কৃষক-চৈতন্যের সাথে। অন্যদিকে, সাংস্কৃতিক তাৎপর্যের ক্ষেত্রে – যেমনটা আহমদ ছফা দেখিয়েছেন – নজরুল মুসলিম সংস্কৃতির অসংখ্য উপাদান বাংলা কবিতায় যুক্ত করে খোদ 'আধুনিক' বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতির পরিসরটাকেই বিপুল ব্যাপকতা দিয়েছেন, আর বিপরীতক্রমে বাঙালি মুসলমানকে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির কেন্দ্রীয় আবহে যুক্ত হওয়ার সাহস জুগিয়েছেন।

অন্তত আরো দুই দিক থেকে নজরুল বাংলা কাব্যধারায় একেবারেই অনন্য। একটি অসাম্প্রদায়িকতার দিক, অন্যটি ঔপনিবেশিক শাসন-বিরোধিতার দিক। ওই দুই দিকই আবার মিলেছে এক বিন্দুতে – রাজনৈতিক সক্রিয়তা ও জাতীয়তাবাদী চেতনায়। নজরুল ঠিক শ্রেণি-রাজনীতির কবি নন, যদিও সাম্যবাদী চেতনা তাঁর কবিতায় প্রবল; আবার 'নিম্নবর্গে'র কবিও নন তিনি, যদিও নিম্নশ্রেণির মানুষের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতির অনিঃশেষ প্রবাহে তাঁর কাব্যলোক মুখর। বরং এক ধরনের জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষাই তাঁর কাব্যে প্রবলভাবে রূপায়িত হয়েছে। এই জাতীয়তাবাদ সম্ভবত ভারতীয় জাতীয়তাবাদ নয়, হয়তবা বাঙালি জাতীয়তাবাদও নয়; বরং সকলের অংশগ্রহণে ও প্রত্যক্ষ লড়াই-সংগ্রামে এ এক গণমুক্তির অভিযাত্রা। তাঁর কবিতায় হিন্দু সংস্কৃতি ও মুসলিম সংস্কৃতির যে ব্যাপক-গভীর যৌথতা দেখি, তাকে রাজনৈতিক বাস্তবতার নিরিখেই পাঠ করতে হবে, নিছক ধর্মীয় সম্প্রীতি বা মানবতাবাদের দৃষ্টিতে নয়।

সামগ্রিকভাবে নজরুলের যে রাজনৈতিক পক্ষ ও সক্রিয়তা – গণতন্ত্রের, গণমুক্তির, স্বাধীনতার ও অসাম্প্রদায়িকতার, তার প্রত্যক্ষ প্রতিপক্ষ ঔপনিবেশিক শাসন। আধুনিক বাংলা সাহিত্য মুখ্যত উপনিবেশিত মধ্যবিত্তের সৃষ্টি বলেই ঔপনিবেশিক শাসনের দাঁত ও নখ এসব সাহিত্যকর্মে বস্তুত অনুপস্থিত; সাহিত্যপাঠের পদ্ধতিগত দিকগুলোতেও এ-সম্পর্কিত সচেতনতা বিশেষ দেখা যায় না। বিপরীতে নজরুল-সাহিত্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ এ বাস্তবতার প্রত্যক্ষতায় রচিত। ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতার অনমনীয় সাহিত্যিক অভিযাত্রায় নজরুলের উচ্চারণকে 'দেশপ্রেম'মূলক জাতীয়তাবাদ দিয়ে বেশ কতকটা ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু এক স্তর গভীরে প্রবেশ করলেই তাতে পাওয়া যাবে অন্যতর যুক্তি ও পর্যালোচনা। দেখা যাবে, তাতে বিরামহীন নির্মিত হয়েছে মানুষের মুক্তির আপসহীন কথামালা। বিরোধিতায় উদ্বুদ্ধ-উজ্জীবিত করা তার বহিরঙ্গ মাত্র। অন্তরঙ্গে আছে জনমানুষের বোধ ও আবেগকে শনাক্ত করার মধ্য দিয়ে এবং প্রতিনিধিস্থানীয় বর্গগুলোর স্বর ও সুরকে উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে খোদ 'মানুষ' বর্গটিকেই নতুন সুরেতে চিহ্নিত করার সাফল্য। বলা যায়, নজরুলের কবিতার 'বিশেষ' স্তরে আছে কালের প্রচণ্ডতা, আর 'নির্বিশেষ' বা সার্বিক স্তরে তিনি পৌঁছেছেন মানুষের যাপিত জীবনের বিচিত্র সংগ্রামী আলেখ্যে, যে সংগ্রাম চিরকালীন। এভাবেই তিনি, আবদুল মান্নান সৈয়দের ভাষা ধার করে বলতে পারি - কালজ হয়েও হয়েছেন কালোত্তর।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সাঁঝের তারা

কাজী নজরুল ইসলাম

সাঁঝের তারার সাথে যেদিন আমার নতুন করে চেনা-শোনা, সে এক বড় মজার ঘটনা।

আরব-সাগরের ওপরে একটি ছোট পাহাড়। তার বুকে রঙ-বেরঙ-এর শাঁখের হাড়ে ভরা। দেখে মনে হয়, এটা বুঝি একটা শঙ্খ-সমাধি। তাদেরই ওপর একলা পা ছড়িয়ে বসে যে কথা ভাবছিলাম সেকথা কখনো বাজে উদাস পথিকের কাঁপা গলায়, কখনো শুনি প্রিয়-হারা ঘুঘুর উদাস ডাকে আর ব্যথাহত ভাষায় কখনো কখনো তার আচমকা একটি কথা হারা কথা–উড়ে-চলা পাখির মিলিয়ে-আসা ডাকের মত শোনায়। সে-দিন পথ চলার নিবিড় শ্রান্তি যেন আমার অণুপরমাণুতে আলস-ছোঁওয়া বুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল। ঘুমের দেশের রাজকুমারী রুখু চুলের গোছাগুলি তার রজনীগন্ধার কুঁড়ির মত আঙুল দিয়ে চোখের ওপর হতে তুলে দিতে বললে, 'লক্ষীটি এবার ঘুমোও।' বলেই সে তার বুকের কাছটিতে কোলের ওপর আমার ক্লান্ত মাথাটি তুলে নিলে। তার সইদের কণ্ঠে আর বীণায় সুর উঠছিল–

অশ্রু-নদীর সুদূর পারে
ঘাট দেখা যায় তোমার দ্বারে!

আমার পরশ-হরষে সদ্য-বিধবার কাঁদনের মত একটা আহত-ব্যথা টোল খাইয়ে গেল। আমি ঘুম-জাগানো কণ্ঠে-ভরা মিনতি এনে বললাম, আবার ঐটে গাইতে বল না ভাই! গানের সুরের পিছু পিছু আমার পিপাসিত চিত্ত হাওয়ার পারে কোন্ দিশেহারা উত্তরে ছুটে চল্‌লো। তারপর... কেউ কোথায় নেই। একা-একা-শুধু একা! ওগো কোথায় আমার অশ্রু-নদী? কোথায় তার সুদূর পার? কোথায় বা তার ঘাট, আর সে কার দ্বারে? দিকহীন দিগন্ত সারা বিশ্বের অশ্রুর অতলতা দিয়ে আরেক সীমাহারার পানে মৌন ইঙ্গিত করতে লাগলো, – ঐ – ঐ দিকে গো ঐ দিকে!'....হায়? কোথায় কোন্ দিকে কে কী ইঙ্গিত করে?

অলস-আঁখির উদাস-চাওয়া আমার সারা অঙ্গে বুলিয়ে মলিন কণ্ঠে কে এসে বিদায়-ডাক দিলে, – 'পথিক উঠ! আমার যাবার সময় হয়ে এল।' আমি ঘুমের দেশের বাদশাজাদির পেশোয়াজ-প্রান্ত দু-হাত দিয়ে মুঠি করে ধরে বললাম 'না, না, এখনো তো আমার ওঠবার সময় হয়নি!...কে তুমি ভাই? তোমার সবকিছুতে এত উদাস কান্না ফুটে উঠছে কেন?' তার গলার আওয়াজ একদম জড়িয়ে গেল। ভেজা কণ্ঠে সে বললে 'আমার নাম শ্রান্তি, আজ আমি তোমায় বড্ডো নিবিড় করে পেয়েছিলাম।... এখন আমি যাই, তুমি ওঠ। আয় সই ঘুম, ওকে ছেড়ে দে।'

জেগে দেখি, কেউ কোথাও নেই, আমি একা। তখন সাঁঝের রানীর কালো ময়ূরপঙ্খী ডিঙিখানা ধূলি-মলিন পাল উড়িয়ে সাগর বুকে নেমেচে।... জানটা কেমন উদাস হয়ে গেল!... যারা আমার সুপ্তির মাঝে এমন করে জড়িয়ে ছিল, তাদের চেতনার মাঝে হারালাম কেন? এই জাগরণের একা-জীবন কী দুর্বিষহ বেদনার ঘায়ে ক্ষত-বিক্ষত, কী নিষ্করুণ শুষ্কতা তিক্ততায় ভরা! সেইদিন বুঝলাম, কত কষ্টে ক্লান্ত পথিকের ব্যর্থ সন্ধ্যা-পথে উদাস পূরবীর অলস ক্রন্দন এলিয়ে এলিয়ে যায়–

'বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে
শূন্য ঘাটে একা আমি, পার করে
নাও খেয়ার নেয়ে!'

হায়রে উদাসীন পথিক! তোর সব ব্যর্থ ভাই, সব ব্যর্থ! কোথায় খেয়ার নেয়ে ভাই? কোন অচিন মাঝিকে এমন বুক-ফাটা ডাক ডাকিস তুই? কোথায় সে? কার পথ চেয়ে তোর বেলা গেল? কে সে তোর জন্ম-জন্ম ধরে-চাওয়া না-পাওয়া ধন? কোন ঘাটে তুই একা বসে এই সুরের জাল বুনছিস? এ ঘাটে কি কোনদিন সে তার কলসিটি-কাঁখে চলতে গিয়ে দু-হাতে ঘোমটা ফাঁক করে তোর মুখে চোখে বধূর আধখানা পুলক-চাওয়া থুয়ে গিয়েছিল? না – কি – সে তার কমল-পায়ের জল- ভেজা পদচিহ্ন দিয়ে তোর পথের স্মৃতির আলপনা কেটে গিয়েছিল? কখনো কাউকে জীবন ভরে পেলি নে বলেই কি তোর এত কষ্ট ভাই?

হায় ও-পারের যাত্রী, তোমার সেই কবে-কখন একটুখানি-পাওয়া হৃদয়-লক্ষ্মীর চরণ ছোঁওয়া একটি ধূলি-কণাও আজও তোমার জন্যে পড়ে নাই। বৃথাই সে রেণু-পরিমল পথে পথে খোঁজা তাই, বৃথা – বৃথা!

অবুঝ মন ওসব কিছু শুনতে চায় না, বুঝতে চায় না। তার মুখে ক্যাপা মনসুরের একটি কথা 'আনল হক'-এর মত যুগ-যুগান্তের ওই একই অতৃপ্ত শোর উঠছে, 'হায় হারানো লক্ষ্মী আমার! হায় আমার হারানো লক্ষ্মী!'

ঘুমিয়েই বরং থাকি ভালো। তখন যে আমি স্বপনের মাঝে আমার না-পাওয়া লক্ষ্মীকে হাজার বার হাজার রকমে পাই। তাকে এই যে জাগরণের মধ্যে পাবার একটা বিপুল আকাঙ্ক্ষা, – বুকে বুকে মুখে মুখে চেপে নিতে, সেই তার উষ্ণ- পাওয়াকে আমি ঘুমের দেশে স্বপনের বাগিচায় বড় নিবিড় করেই পাই। মানুষের মন মস্ত প্রহেলিকা। মন নিক্তির মতন যখন যেদিকে তার বেশি পায়, সেই দিকেই নুয়ে পড়ে। তাই কখনো মনে করি পাওয়াটাই বড়, পাওয়াতেই সার্থকতা আবার পরক্ষণেই মনে হয়, না-না পাওয়াকে পাওয়া, ওই না-পাওয়াতেই সকল পাওয়া সুপ্ত রয়েছে। এ সমস্যার আর মীমাংসা হলো না। অথচ দুই পথেরই লক্ষ্য এক।

দুই স্রোতেরই লক্ষ সাগর-প্রিয়ার সীমাহারা বুকে নিজের সমস্ত বেগ সমস্ত গতি সমস্ত স্রোত একেবারে শেষ করে ঢেলে দেওয়া, তারপর নিজের অস্তিত্ব ভুলে যাওয়া-শুধু এক আর এক! কিন্তু এই 'প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর' কথাটার এমন একটা নেশা আর মাদকতা রয়েছে, যেটা অনবরত আমার মনের কামনা- কিশোরীকে শিউরিয়ে তুলছে এবং বলছে 'বন্ধনেই মুক্তি' – এই যে মানব-মনের চিরন্তনী বাণী, সেটা কি মিথ্যা? না, এ সমস্যার সমাধান নেই।

আবার মনটা গুলিয়ে যাচ্ছে।

আমার মনের ভোগ আর বৈরাগ্যের একটা নিষ্পত্তিও হল না, আর তাই কাউকে জীবন ভরে পাওয়াও হল না।

তবে?.... ...

কাউকে না পেয়েও আমার মনে এ কোন আদিম-বিরহী ভুবন-ভরা বিচ্ছেদ-ব্যথায় বুক পুরে মুলুকে মুলুকে ছুটে বেড়াচ্ছে? ক্যাপার পরশ-মণি খোঁজার মতন আমিও কোন পরশ-মণির ছোঁওয়া পেতে দিকে দিকে দেশে দেশে ঘুরে মরছি? কোন লক্ষ্মীর আঁচল-প্রান্তে বাঁধা রয়েছে সে মানিক? কোন তরুণীর গলায় রক্ষা-কবচ হয়ে ঝুলছে সে পাথর?

ভাবতে ভাবতে চোখে জল গড়িয়ে এল। সেই জলবিন্দুতে সহসা কার দুষ্টু হাসির চপল কিরণ ছল ছলিয়ে উঠলো। আমি চমকে সামনে চাইতেই দেখলাম, আকাশের মুক্ত আঙিনায় ললাটের আধকালি ঘোমটা টেনে প্রদীপ-হাতে সাঁঝের তারা দাঁড়িয়ে। তার চোখের কিনারায়, মুখের রেখায়, অধরপুটের কোণে কোণে দুষ্টুমির হাসি লুকোচুরি খেলছে। বারে বারে উছলে-উঠা নিলাজ হাসি ঠোঁটের কাঁপন দিয়ে লুকোবার ব্যর্থ চেষ্টায় তার হাতের মঙ্গল-প্রদীপ কেঁপে কেঁপে লোলুপ শিখা বাড়িয়ে সুন্দরীর রাঙা গালে উষ্ণ চুম্বন এঁকে দেওয়ার জন্য আকুলি-বিকুলি করছে। পাগল হাওয়া বারেবারে তার বুকের বসন উড়িয়ে দিয়ে বেচারীকে আরো অসম্বৃত, আরো বিব্রত করে তুলছে।

অনেকক্ষণ ধরে সেও আমার পানে চেয়ে রইল, আমিও তার পানে চেয়ে রইলাম। আমার কণ্ঠ তখন কথা হারিয়ে ফেলেছে।

সে ক্রমেই অস্তপারের-পথে পিছু হেঁটে যেতে লাগলো। তার চোখের চাওয়া ক্রমেই মলিন সজল হয়ে উঠতে লাগলো। বড় বড় নিশ্বাস ফেলানোর দারুণ তার বুকের কাঁচুলি বায়ুর মুখে কচিপাতার মত থরথর করে কাঁপতে লাগলো। যতই সে আকাশ-পথ বেয়ে অস্ত-পল্লীর পথে চলতে লাগলো, ততই তার মুখ-চোখ মূর্ছাতুরের মতন হলদে ফ্যাকাসে হয়ে যেতে লাগলো। তারপর পথের শেষ-বাঁকে দাঁড়িয়ে সে তার শেষ অপচল চাওয়া চেয়ে আমার একটি ছোট্ট সেলাম করে অদৃশ্য হয়ে গেল। হিয়ায় হিয়ায় আমার শুধু একটি কাতর মিনতি মূকের মত না- কওয়া ভাষায় ধ্বনিত হচ্ছিল– 'হায় সন্ধ্যা-লক্ষ্মী আমার, হায়!'

হঠাৎ আমার মনে হলো , আমি কত বছর

ধরে যে এই রকম করে, রোজ সন্ধ্যা-লক্ষীর পানে চেয়ে আসচি তা কিছুতেই স্মরণ হয় না। শুধু এইটুকু মাত্র মনে পড়ে যে, সে কোন যুগে আমি আজিকার মতনই এমনি করে প্রভাতের শুকতারাটির পানে শুধু উদয়-পথে তাকিয়ে থাকতাম। আমার সমস্ত সকাল যেন কোন্ প্রিয়তমার আসার আশায় নিবিড় সুখে ভরে উঠতো। রোজ প্রভাতে উদয়-পথে মুঠি-মুঠি করে ফাগ-মাখা ধূলি-রেণু ছড়াতে ছড়াতে সে আসতো, তারপর আমার পানে চেয়েই সলজ্জ তৃপ্তির হাসি হেসে যেন বারে বারে আড়-নয়নের বাঁকা চাউনি হেনে বলতো, 'ওগো পথ-চাওয়া বন্ধু আমার, আমি এসেছি!' আমি তার চোখের ভাষা বুঝতে পারতাম, তার চাওয়ার কওয়া শুনতে পেতাম।... তারপর অরুণদের তাঁর রক্ত-চক্ষু দিয়ে আমাদের পানে চাইলেই সে ভীতা বালিকার মত ছুটে আকাশ আঙিনা বেয়ে ঊর্ধ্বে-ঊর্ধ্বে – আরো ঊর্ধ্বে উধাও হয়ে যেত। ছুটতে ছুটতেও কত হাসি তার! সারাদিন আমি শুনতে পেতাম তার ঐ পালিয়ে যাওয়া পথের বুকে তার কটি-কিঙ্কিণীর রিণিরিণি, হাতের পান্নার চুড়ির রিণিঝিণি আর পথের গুঞ্জরী পাঁইজোরের রুমঝুম!...

এমন করে দিন যায়।... একদিন আমি বললাম 'তুমি কি আমার পথে নেমে আসবে না প্রিয়?' সে আমার পানে একটু তাকিয়েই সিঁদুরে আমের মত রেঙে উঠে আধ-ফোটা কথায় কেঁপে কেঁপে বল্লে 'না প্রিয়, আমায় পেতে হলে তোমাকে এই তারারই একটি হতে হবে। আমি নেমে যেতে পারি নে, তোমাকে আমার পথেই উঠে আসতে হবে।' বলবার সময় অনামিকা আঙুলি দিয়ে তার বেনারসী চেলীর আঁচলপ্রান্ত যেমন সে আনমনে জড়িয়ে যাচ্ছিল, তার চোখের চাওয়া মুখের কথা সেদিন যেন তেমনি করেই অসহ্য ব্যথা-পুলকে জড়িয়ে জড়িয়ে যাচ্ছিল। বুঝলাম, সে বিশ্বের চিরন্তন ধারাটি বজায় রেখেই আমার সঙ্গে মিলতে চায়। আমার সৃষ্টিছাড়া-পথে বেরিয়ে পড়তে তার কোমল বুকে সাহস পাচ্ছে না। যতই ভালোবাসুক না, আমার পথ-হারা পথে চলতে – আমার বিপুল ভার বয়ে সেই অজানা ভয়ের পথে চলতে – সে যেন কিছুতেই পারবে না। কিন্তু তাই কি? হয়ত তা ভুল। কেননা একদিন যেন সে বলেছিল, 'প্রিয়তম, এ যে তোমার ভুলের পথ, এ পথ ত মঙ্গলের নয়। আঘাত দিয়ে তোমায় এ পথ হতে ফিরাতেই হবে। তোমার কল্যাণের পথে না আনতে পারলে তো আমি তোমার লক্ষী হতে পারি নে।' সে কথা যে আজকের নয়, কোন অজানা নিশীথে আমি ঘুমের কানে শুনেছিলাম। তখন তা কিন্তু বুঝতে পারিনি।

আমি যেমন কিছুতেই তার চিরন্তন ধারাটির একঘেঁয়েমি সইতে পারলাম না, সেও তেমনি নীচে নেমে আসার পথে এল না।

বিদায় নেবার দিনও সে তেমনি করে হেসে গেছে। তেমনি করেই তার দুষ্ট চটুল চাউনি দিয়ে সে আমায় বারেবারে মিষ্টি বিদ্রুপ করেছে। শুধু একটি নতুন কথা শুনিয়ে গেছিল, 'আর এ পথে আমাদের দেখা হবে না প্রিয়, এবার নতুন করে নতুন পরিচয় নিয়ে আমরা আমাদের পূর্ণ করে চিনবো।' তার বিদায়-বেলায় যে দীঘল শ্বাসটি শুনেও শুনি নি, আজ আমি সারা বাতাসে যেন সেই ব্যথিত কাঁপুনিটুকু অনুভব করছি। এখন সে বাতাস নিতেও কষ্ট হয়।... কবে আমার এ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে-টেনে-নেওয়া বায়ুর আয়ু চিরদিনের মত ফুরিয়ে যাবে প্রিয়?... তার বিদায় চাওয়ার যে ভেজা দৃষ্টিটুকু আমি দেখেও দেখি নি, আজ সারা আকাশের কোটি কোটি তারার চোখের পাতায় সেই অশ্রুকণাই দেখতে পাচ্ছি! এখন তারা হাসলেও মনে হয়, ও শুধু কান্না আর কান্না!

তারপর রোজ আসি রোজ যাই, কিন্তু উদয়-পথে আর তার রাঙা চরণের আলতার আলপনা ফুটলো না! এখন অরুণ রবি আসে হাসতে হাসতে। তার সে হাসি আমার অসহ্য। পাখির কণ্ঠের বিভাস সুর আমার কানে যেন পূরবীর মত করুণ হয়ে বাজে।...

আমি বললাম 'হায় প্রিয়তম, তোমায় আমি হারিয়েছি।' দেখলাম, আকাশ বাতাস আমার সে কান্নায় যোগ দিয়েই বলছে, 'তোমায় হারিয়েছি!' তখন সন্ধ্যা — ঐ সিন্ধু-বেলায়।

হঠাৎ ও 'কার চেনা-কণ্ঠ শুনি?' ও কার চেনা-চাওয়া দেখি?' ও কে রে কে? বললাম, 'আজ এ বধুর বেশে কোথায় তুমি প্রিয়?' সে বল্লে, 'অস্ত-পথে!'

সে আরও বলে গেছে যে, সে রোজই তার ম্লানমূর্তি নিয়ে এই অস্ত-গাঁয়ের আকাশ-আঙিনায় সন্ধ্যা-প্রদীপ দেখাতে আসবে। আমি যেন আর তার দৃষ্টির সীমানায় না আসি।

বুঝলাম সে যতদিন অস্ত-পারের দেশে বধূ হয়ে থাকবে, ততদিন তার দিকে তাকাবারও অধিকার নেই। আজও সেই তার জগতের সেই চিরন্তন সহজ ধারাটুকুকে বজায় রেখে চলছে। সে তো বিদ্রোহী হতে পারে না। সে যে নারী কল্যাণী। সে-ই না বিশ্বকে সহজ করে রেখেছে, তার অনন্ত ধারাটির অক্ষুন্ন সামঞ্জস্য দিয়ে ঘিরে রেখেছে।

শুধোলাম, 'আবার কবে দেখা হবে তবে? আবার কখন পাবো তোমায়?' সে বললে,'প্রভাত বেলায় ওই উদয়-পথেই।'

আজ সে বধূ, তাই তার সাঁঝের-পথে আর তাকাই নি।

জানি নে, কবে কোন উদয়-পথে কোন নিশিভোরে কেমন করে আমাদের আবার দেখা-শোনা হবে। তবু আমার আজো আশা আছে, দেখা হবেই, তাকে পাবই।

*   *   *

সিন্ধু পেরিয়ে ঘরের আঙিনায় যখন একা এসে ক্লান্ত চরণে দাঁড়ালাম, তখন ভাবিজী জিজ্ঞাসা করলেন হাঁ ভাই, তুমি নাকি 'বে করেছ?' আমি মলিন হাসি হেসে বললাম 'হাঁ!' তিনি হেসে শুধোলেন, 'তা বেশ করেছ। বধূ কোথায়? নাম কি তার?'

অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বসে রইলাম। শ্রী-রাগের সুরে সুর-মূর্ছিতা মলিনা সন্ধ্যার ঘোমটার কালো আবছায়া যেন সিয়াহ কাফনের মত পশ্চিম-মুখী ধরণীর মুখ ঢেকে ফেলতে লাগলো। আমি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম।

তারপর অতিকষ্টে ঐ পশ্চিম-পারের পানে আঙুল বাড়িয়ে বললাম, অস্তপারের সন্ধ্যা-লক্ষী।'

ভাবিজানের ডাগর আঁখিপল্লব সিক্ত হয়ে উঠলো; দৃষ্টিটুকু অব্যক্ত ব্যথায় নত হয়ে এলো। কালো সন্ধ্যা নিবিড় হয়ে নেমে এলো।

রাসূলের শানে

গোলাম নবী পান্না

রাসূলের শানে কবিতা লেখার বড়ো সাধ জাগে মনে
অতো কি সহজ তাঁকে নিয়ে লিখি আমি এ ক্ষুদ্র জনে।

তাওতো মনের ব্যাকুলতা বেশী উম্মত তাঁরই বলে
জানি না আমার ঠাঁই মেলে কি না তাঁর মায়া ছায়া তলে।

তবু বিশ্বাস তাঁকে নিয়ে যদি দু'কলম আমি লেখি
হয়তো ভাগ্যে এসে যেতে পারে এ অভাগার নেকি।

নবীর নামে দরুদ পড়ার সময় কি খুব দিলাম?
তাঁকে নিয়ে তাই লিখতে এ কবি কলম হাতে নিলাম।

কলমের কালি ফুরায় সাথে টান পড়ে যায় দোয়াতে
জানিনা এ কালি পারবে কি না নবীর দয়াকে ছোঁয়াতে।

নবী জানি বড়ো দয়ালু খুব উম্মতেরই টানে
কবিতা লেখার সাহসটা পাই তাই রাসূলের শানে।

শরতের বারতা

রওশন আরা পম্পা

এসেছে শরৎ তবুও কেন আকাশের মুখ ভার
থেকে থেকে বৃষ্টি নামে টাপুর টুপুর
কখনো মুষলধারে।
তারই মাঝে শরতের ছবি
আকাশে কত মেঘের ভেলা
চারিদিকে দেখি শরতের রূপ
যায়না তা ঢেকে রাখা।

মাঠখানি জুড়ে ফসলের হাসি
সোনালী রঙের বাহার,
আনন্দ তাই সবার মাঝে
কাজে নাই কোন ক্লেশ।

টগর , মাধবী, গন্ধরাজ, মালতী কামিনী,
দোলন চাঁপা,শিউলি ফুলের হাসি
যুঁই, কেয়া,জবা,রাধাচূড়া,
ছাতিম, বেলি,নয়নতারা
কত যে ফুল ফুটেছে চারিদিকে।
পুকুরে ফুটেছে লাল সাদা শাপলা, পদ্মফুল
স্থলপদ্ম, ধুতরা ঝিঙে ফুল।

ফুলের ঘ্রাণে চারিপাশ মাতোয়ারা
তারি মাঝে কাশ ফুল তার শুভ্র রঙে
শরৎকে চিনিয়ে দেয়।
কাশেরবনে হারিয়ে যেতে কত যে
লাগে ভালো

দুখু'র জয়

কল্পনা সরকার

দুঃখ জড়িয়ে গায়ে এসেছিলে মাটির ঘরে
– সূর্যালোকের অফুরন্ত বার্তা নিয়ে!
রিক্তের বেদনা আঁকড়ে বিদ্রোহী চেতনা বক্ষে
যুগাতিযুগ ধ'রে নিমগ্ন সাধনা সুখে।
জোয়ারের ঈশারায়- ভাটা উপেক্ষা ক'রে
উচ্ছসিত পরাণে ভাসিয়ে দিয়েছ
সাগর মোহনায় আনন্দধারা.....
গগনচুমি স্বাপ্নিক হৃদয়ে নারীকে করেছ প্রজ্বলিত বহ্নিশিখা
আকাশে বাতাসে তুমি দুরন্ত ঝড়!
সাম্প্রদায়িকতার চিহ্ন আঁকেনি বিধাতা তোমার চিত্তে–
ছিলে সাম্য মৈত্রী বন্ধনের বৃত্তে,
সুরে স্বরে বাণীতে, কাব্যগীতে কেউ নয় কারো পর
তুমি নন্দিত অমর!
তুমি অক্ষয় দুখু'– তোমারই জয়।।

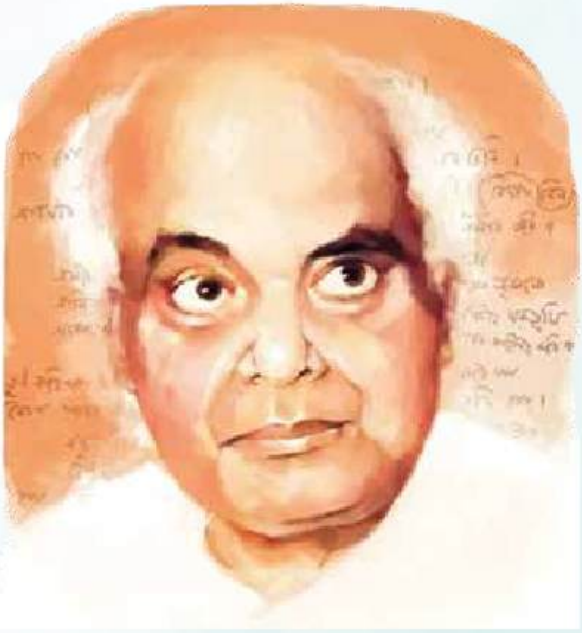

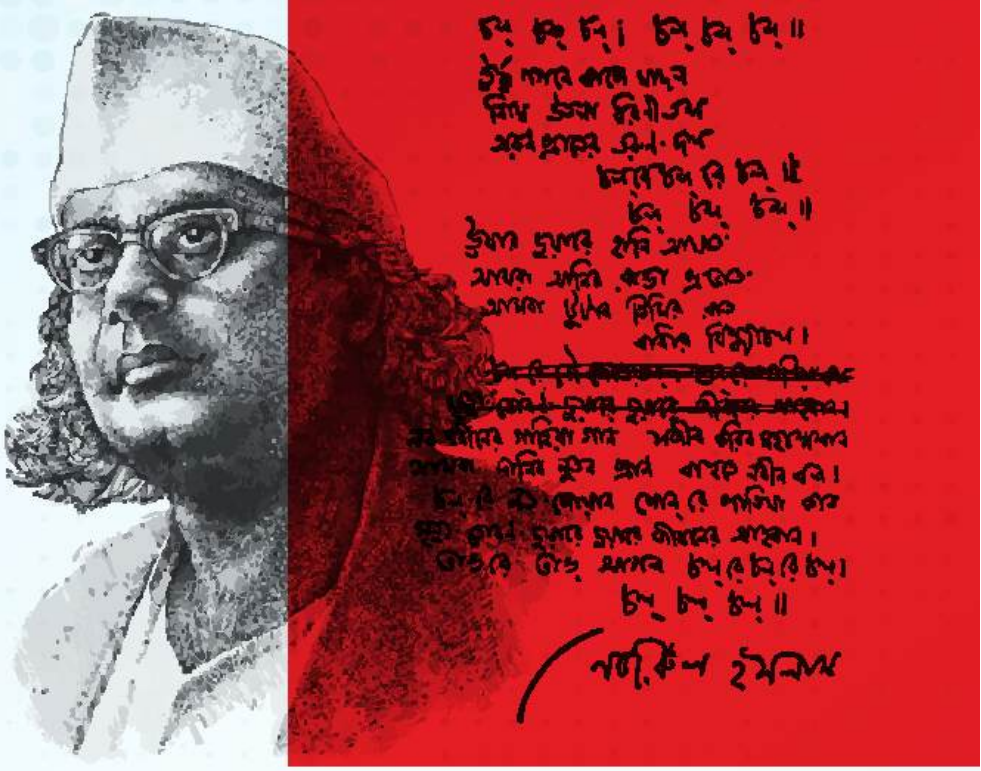

নজরুল কাব্যে বিদ্রোহের আগুন

আরিফা খানম

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি একাধারে প্রেমের কবি, মানবতার কবি, সাম্যের কবি এবং বিদ্রোহের কবি। তবে, বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী কবি নজরুলের বিদ্রোহী সত্তাই মানুষকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছে। মানুষ তার এই বিদ্রোহী সত্তাকে কুর্নিশ জানিয়েছে বার বার।

পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ ঔপনিবেশিক সমাজে কবির জন্ম ও বেড়ে ওঠা। তিনি জন্মের পর থেকেই দেখেছেন শাসকের নির্মম, শোষণ, নির্যাতন, অবহেলা। কবির বর্ণনায়...

"দেখিনু সেদিন রেলে, কুলি বলে এক
বাবুসাব তারে ঠেলে দিলে নীচে ফেলে"

সামাজিক বৈষম্যের কারণে প্রতিনিয়ত এদেশের মানুষ নির্যাতিত। পরাধীনতার নিষ্ঠুরতা কবির মনোজগতকে বিদ্রোহী করে তুলেছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই কিন্তু শুধুমাত্র দেশের স্বাধীনতালাভই তার বিদ্রোহের মূল লক্ষ্য ছিল না। তার বিদ্রোহ ছিল আরো ব্যাপক আরো বিস্তৃত। কোনো শক্তির কাছে তিনি মাথা নত করতে চাননি আর তাই কবিতায় তাঁর নির্ভীক উচ্চারণ...

"আমি বেদুইন আমি চেঙ্গিস
আমি আপনাকে ছাড়া করি না কাহারে
কুর্নিশ।"

তার বিদ্রোহ ও প্রতিবাদের কঠোর উচ্চারণে ইংরেজ শাসনের ভিত্তি নড়ে উঠেছিল। তিনি সাম্রাজ্যবাদী শাসকের বিরুদ্ধে ঘোষণা করেন

"আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার
নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব, আনিব শান্তি শান্ত-
উদার"

অন্যায় অত্যাচার নিঃশেষ করে সারা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন বিদ্রোহ বিপ্লবের মাধ্যমে। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন সত্য সুন্দর ও কল্যাণের পূজারী। এই সত্য সুন্দর ও কল্যাণের প্রতিষ্ঠায় নতুন সমাজ গড়তে হলে ঘুনে ধরা সমাজকে ভাঙতে হবে। তার সেই নতুন সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে "প্রলয়োল্লাস"-এ

"ধ্বংসে দেখে ভয় কেন তোর প্রলয় নতুন
সৃজন-বেদন
আসছে নবীন জীবন-হরা অসুন্দরে
করতে ছেদন,"

জীর্ণ পুরাতনকে ভেঙে নতুন করে গড়াই ছিল তার বিদ্রোহের মূল উদ্দেশ্য।

মনে প্রানে বিদ্রোহী ছিলেন কবি, তাই অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন সবসময়।তার সংগ্রাম ছিল শোষিত নিপীড়িত মানুষের কল্যাণের জন্য। সামাজিক বৈষম্য, বিভেদ, সাম্প্রদায়িকতা, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি সবসময় প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করেন। তিনি বিদ্রোহী কবিতায় দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন...

"যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল

আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে
রণিবে না
মহা বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত
আমি সেই দিন হবো শান্ত"

তাই তারুন্যদীপ্ত প্রতিবাদী মানুষের কাছে কবি নজরুল চির বিদ্রোহীর প্রতীক। পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ এদেশের মানুষকে মুক্তির গান শুনিয়েছেন কবি নজরুল।

কবি কাজী নজরুল ইসলাম যখন সাহিত্য জগতে আবির্ভূত তখন সমকালীন সাহিত্যে অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হলেও শাসকের বিরুদ্ধে, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে, ধর্মের নামে অধর্মের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করার মত দুঃসাহস কারো হয়নি। কবিতাকে সরাসরি অন্যায়ের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে কবি কাজী নজরুল ইসলামের মত আর কেউ গ্রহণ করেন নি। এই কঠিন কাজটি কবি নজরুলের পক্ষেই করা সম্ভব হয়েছিল।

সামাজিক বৈষম্য, অনাচারের প্রতিবাদে বিদ্রোহ ঘোষণা করে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে রণতূর্যই ধারণ করেননি তিনি বিদ্রোহী ভৃগুর মতো বিধাতা পুরুষের বুকে পদাঘাত করার দুঃসাহস দেখিয়েছেন...

'আমি বিদ্রোহী ভৃগু ভগবান বুকে এঁকে দিই
পদচিহ্ন '

শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এই নির্ভীক উচ্চারণের মধ্যেই কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী চেতনার বহিঃপ্রকাশ। নজরুলের এই বিদ্রোহী সত্তার প্রকাশ শুধু বিদ্রোহী কবিতাই নয় অন্যান্য কবিতায়ও লক্ষ্য করা যায় এবং এই বিদ্রোহ শুধুমাত্র শাসক ও শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধেই ঘোষিত হয়নি, সমাজের যেখানেই বৈষম্য, অনাচার, নিপীড়ন দেখেছেন সেখানেই প্রতিবাদ করেছেন। ধূমকেতু কবিতায় রুদ্ররূপ আমরা দেখেছি তার বলিষ্ঠ উচ্চারণে...

"আমি যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুনঃ
মহাবিপ্লব হেতু
এই স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু।"

সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দ্বারা পদদলিত এদেশ দীর্ঘকাল শাসন-শোষণ, অন্যায় অবিচার আর বৈষম্যের কালো অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। একজন কবি সমাজ, দেশ, রাজনীতি ও সংস্কৃতির মধ্যে থেকে জীবনরস পান করে হয়ে ওঠেন সমাজ সচেতন। বিশ্ব কবি তাঁর কবিতায় একসময় বলেছিলেন...

"যেথা তার যত ওঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি।"

বস্তুত সমাজ সচেতন কবি সাহিত্যিকের সূক্ষ্ম দৃষ্টি থেকে কোনো কিছুই এড়িয়ে যায় না তাই লেখনীর মাধ্যমেই তারা সরব হয়ে ওঠেন। আর কবি নজরুল তাঁর বিদ্রোহী মানসিকতাকে শব্দ, ছন্দ, অলঙ্কারের যথাযথ ব্যবহারে আরও জীবন্ত প্রাণময় করে তুলেছেন। মানুষের মধ্যে বিদ্রোহী সত্তা জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন।

১৯২২ সালের ৬ জানুয়ারী 'বিজলী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় কবির 'বিদ্রোহী' কবিতা। এই কবিতা কবিকে খ্যাতির শীর্ষে নিয়ে যায়। কবি রাতারাতি 'বিদ্রোহী' কবির বিশেষণে ভূষিত হন। সমাজ থেকে অন্যায় অত্যাচার বৈষম্য নির্মূল করে সমস্ত কুসংস্কারের বেড়াজাল ভেঙে এক নতুন সমাজ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয় নজরুল প্রতিভাকে কালোত্তীর্ণ করে তুলেছিল। কবিতাও যে সমাজ পরিবর্তনের বড় হাতিয়ার হতে পারে তা নজরুল উচ্চারণ করলেন দীপ্ত ভঙ্গিতে...

আমি দুর্বার, আমি ভেঙে করি সব চুরমার
আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল,
আমি দলে যাই
যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল।

কবি নজরুলের এই বিদ্রোহী চেতনার অন্তরালে ছিল মানুষের প্রতি ভালোবাসা। অসাম্প্রদায়িক চিন্তা ভাবনা, মানবতাবাদী চিন্তা ভাবনাই তাকে দ্রোহের চেতনায় উজ্জীবিত করেছে। তৎকালীন সমাজের নানামুখী বৈষম্য, সাম্প্রদায়িকতা এবং কুসংস্কার থেকে উত্তরণের জন্য তিনি বিদ্রোহের পথেই এগিয়ে চলেছেন। হিন্দু অধ্যুষিত সমাজের এক সাধারণ মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ তাঁর। জন্মের পর প্রত্যক্ষ করেছেন সমাজে ধর্মের নামে ভন্ডামি , জাতের নামে বজ্জাতি। তাছাড়াও সমাজে রয়েছে ধনী-দরিদ্র, সাদা-কালো, নারী-পুরুষের মত হাজারো বিভেদ বৈষম্য। এই বৈষম্যের শিকার ছিল সাধারণ অসহায় মানুষ। এধরনের অনাচার থেকে রক্ষা পেতেই তিনি তাঁর জীবনে বিদ্রোহ বিপ্লবকে স্বাগত জানিয়েছেন।

তবে একথা অনস্বীকার্য যে কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহ শুধুমাত্র সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে নয়, সমকালীন সমাজে যেখানেই অনিয়ম দেখেছেন সেখানেই প্রতিবাদে সরব হয়েছেন। শুধুমাত্র প্রচলিত প্রথাকে ভাঙার জন্য নয় নতুন করে সমাজ গড়ার আকাঙ্ক্ষাও ছিল তার । প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ কে একটা চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন...

"নতুন করে গড়তে চাই বলেই তো ভাঙি...
শুধু ভাঙার জন্য ভাঙার গান আমার নয়।"

ধ্বংসের মধ্য দিয়ে নতুন সৃষ্টির লক্ষ্যে কবির বিদ্রোহী সত্তা সার্থকতা লাভ করেছে। কবি কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে বলতে গিয়ে সমালোচক ধ্রুব কুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন...

"নজরুলের কাব্যাদর্শই হলো পুরাতনের ধ্বংস আর নতুনের উত্থান... কবিতায় তারই ছন্দবদ্ধ রূপায়ণ। ধ্বংস দেখে কবি ভয় পান না। তিনি নিজেকে নটরাজ, সাইক্লোন, ধ্বংস ইত্যাদি ঘোষণার পর গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনি ও চঞ্চল মেয়ের ভালোবাসায় মদির। নজরুলের জীবনাদর্শ ও কাব্যাদর্শ বিদ্রোহী কবিতায় নানা রূপকল্পে বিভাসিত।"

মূলত বাংলা কাব্যে বিদ্রোহ,
পৌরুষ ও তারুণ্যের যৌবনদীপ্ত পদচারণায় নজরুল অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

অগ্নিবীনা, বিষের বাঁশী, সাম্যবাদী, সর্বহারা, ফণি মনসা, জিঞ্জির, সন্ধ্যা, প্রলয়শিখা এসব কাব্যের মূল সুর মূলতঃ এক। কবির বিদ্রোহী সত্তাই এসব কাব্যে লক্ষ্য করা যায়। ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি প্রতিটি বিষয় নিয়ে কবির মনোজগতের বিক্ষোভ, বিদ্রোহ, হতাশা ব্যর্থতার আশা নিরাশার দোলাচল কাব্যরূপ লাভ করেছে।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সাইন্স
মোহাম্মদপুর, ঢাকা

হিলফুল ফুযূল

ড. মোঃ আবদুল কাদির

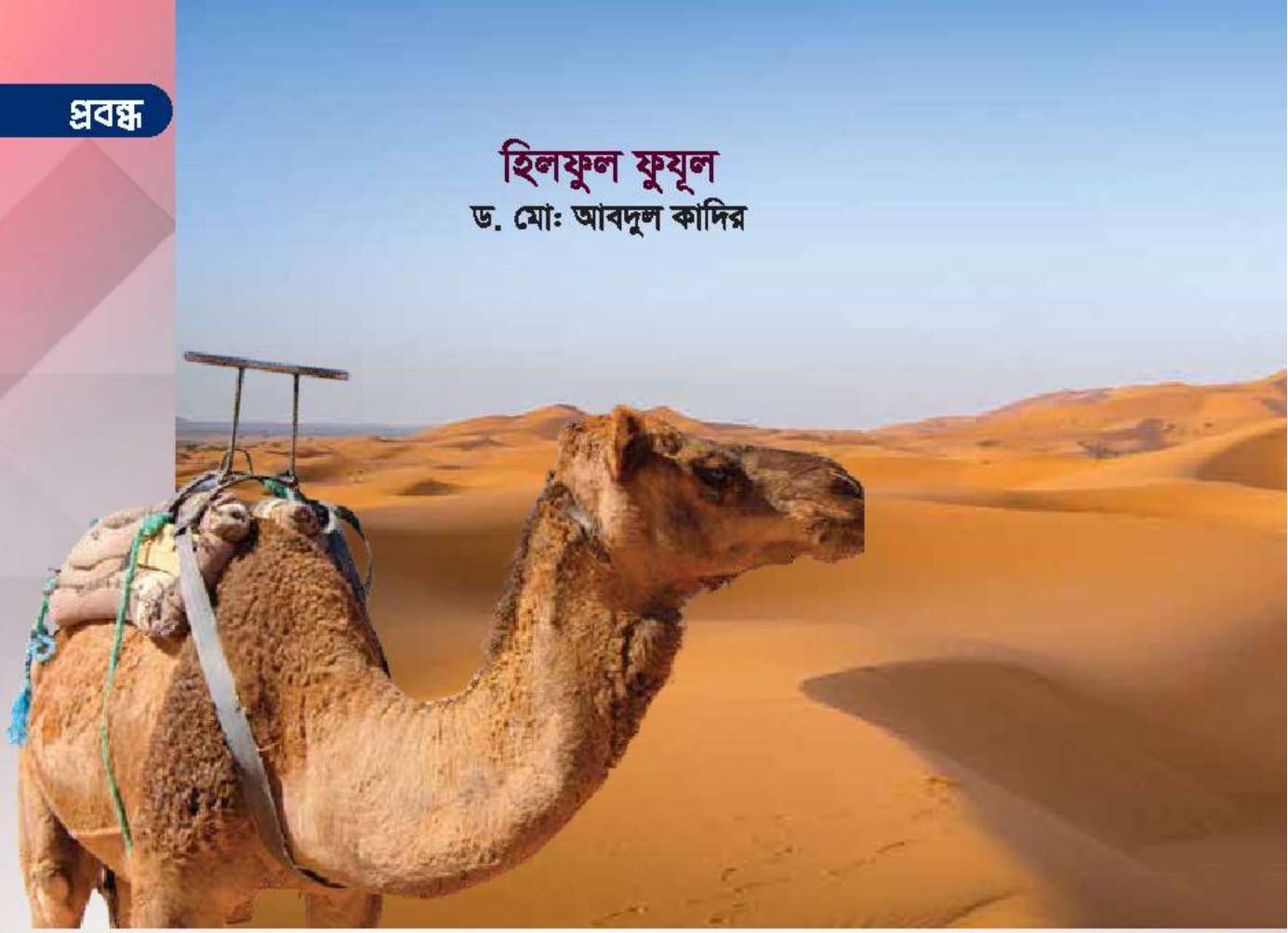

একটি সামাজিক সংঘ। এর শাব্দিক অর্থ হলো "শান্তির সংঘ" বা "কল্যাণের শপথ" (হলফ অর্থ শপথ এবং ফুযূল বা ফযিলত মানে মঙ্গল)। এটি জিলকদ মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭ বছর বয়সে এই সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। এটি পৃথিবীর ইতিহাসের প্রথম শান্তি সংঘ। এই সংঘ পবিত্র মক্কায় প্রতিষ্ঠিত হয়। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলইহি ওয়াসাল্লাম) ইসলাম পূর্বযুগে এই সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংগঠনের কাজ ছিল পীড়িতদের সাহায্যদান, দুস্থদের আশ্রয়দান এবং অসহায়দের সহায়তা করা, বিদেশি ব্যবসায়ীদের জান মালের সুরক্ষার নিশ্চয়তা দেয় ইত্যাদি। এ সংগঠনের প্রভাবে মক্কা অনেক বিপর্যয় থেকে রেহাই পায়। কা'বা ঘরের কালোপাথর পুনঃস্থাপনেও এই সংঘটি ভূমিকা পালন করে।

কুরায়শ জাতি নিজেদের মধ্যে নানা ঝামেলায় জড়িয়ে ছিল। এক অমীমাংসিত খুনের মামলায় যুদ্ধ অবদ্দি বেধে যায়। যা ফিজার যুদ্ধ নামে পরিচিত। এই যুদ্ধ ৫ বছর অব্যাহত ছিল অনেক কুরাইশ নেতা সিরিয়া ও আবিসিনিয়ায় হলে যান, যেখানে তারা শান্তি পাবেন। এইসব জায়গায় শক্ত আইন বলবৎ থাকলেও আরবে ছিল না।

ফিজার যুদ্ধের পরিণতি হিসাবে কুরাইশরা বুঝতে পারে, মক্কা শহরের অবনতি নিজেদের মধ্যকার ঝামেলার ফল। ইয়েমেনের যাবিদ শহরের এক বণিক শাম এলাকার কিছু ব্যক্তিকে দ্রব্য বিক্রি করে প্রতারিত হয়ে কুরাইশদের দ্বারস্থ হন। ফিজার যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় 'আবদুল্লাহ ইব্ন জুদ'আনের ঘরে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চাচা যুবায়র একটি সভা আহবান করলেন। সভায় হাশিম, যুহরা প্রভৃতি গোত্রের বিশিষ্ট কুরাইশীগণ একত্রিত হলেন। সভায় আলোচনান্তে একটি সেবা-সংঘ গঠিত হলো।

এ সংঘের সদস্যগণ নিম্নোক্ত কাজগুলো করার শপথ ও প্রতিজ্ঞা করেন :

১) আমরা দেশের অশান্তি দূর করব।
২) আমরা বিদেশি পর্যটকদের রক্ষা করব।
৩) আমরা গরীব দুঃখীদিগকে সাহায্য করব।
৪) আমরা শক্তিশালীদিগকে দুর্বলদের ওপর অত্যাচার করতে দেব না।

সেবকগণ আল্লাহ্র নামে শপথ করে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন, তারা উৎপীড়িত ও অত্যাচারিতদের সমর্থন করবেন এবং অত্যাচারীর কাছ থেকে অত্যাচারিতদের প্রাপ্য আদায় করবেন। যেহেতু 'আরবী ভাষায় প্রতিজ্ঞাকে 'হিলফ্' এবং অত্যাচারীর কাছে অত্যাচারিতদের প্রাপ্য অধিকারকে 'ফযূল' বলা হয়। এজন্যই এ সেবাসংঘ 'হিলফুল ফযূল' এবং এর সদস্যগণ 'আহ্লু হিল্ফুল ফযূল' নামে বিখ্যাত।

কেউ কেউ বলেন : বহু আগে জুমহুরীদের আমলেও এমন একটি সেবা-সংঘ গঠিত হয়েছিল। এই সেবাসংঘ রাসূলুল্লাহ্

(সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- এর জন্মের কত বছর পূর্বে গঠিত হয়েছিল তা কোনো ঐতিহাসিক তথ্যে পাওয়া যায় না। কালের বিবর্তনে 'আরবদের মধ্যে শুধু সে নামটিই স্মরণীয় হয়ে থাকে। সে সময়ে 'হিল্‌ফ' শব্দের সাথে ফযুল সংযুক্ত করার কারণ হলো–কুতায়বার মতে সর্বপ্রথম তিনজন একত্রিত হয়ে এ সংঘ গঠিত হয়েছিল, আর তাদের তিনজনের নামের মূলধাতু ছিল ফা-য-ল। (ক) ফুযায়ল ইব্‌ন হারিস আল-জুরহুমী; (খ) ফুযায়ল ইব্‌ন ওয়াদা'আ আল-কাতূরী; (গ) মুফাযযাল ইব্‌ন ফাযালা আল-জুরহুমী এ তিন ব্যক্তি উক্ত সংঘের আহ্বায়ক ছিলেন। তাঁদের নামানুসারে উক্ত সংঘকে হিলফুল ফযূল বলা হতো। লুপ্ত সংঘের নামানুসারে কুরাইশদের সেবা-সংঘও 'হিলফুল ফযূল' নামে পরিচিতি লাভ করে।

ইব্‌ন হিশাম রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অংশগ্রহণ সংক্রান্ত হাদীস উল্লেখ করে বলেন, প্রাপকের সম্পদ (আল-ফুযূল) তাকে ফেরত দেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন বিধায় এর নাম 'হিলফুল ফুযূল' হয়েছে। অর্থাৎ তারা অঙ্গীকার করে যে, তারা (লুণ্ঠিত সম্পদ) 'ফুযূল' প্রাপককে ফেরত দেবে এবং যালেম যেন মাজলুমের উপর বাড়াবাড়ি করতে না পারে সেদিকে লক্ষ রাখবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও এই সমিতির সদস্য ছিলেন। তিনিও 'আবদুল্লাহ্ বিন্ জুদ'আনের ঘরে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং অন্য সদস্যদের সাথে শপথ ও প্রতিজ্ঞায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি নবুওয়ত প্রাপ্তির পর বলেন,

আমি আমার চাচাদের সাথে 'আবদুল্লাহ্ বিন জুদ'আনের ঘরে শপথ করে প্রতিজ্ঞা করেছি। তার বিনিময়ে আমাকে রক্তবর্ণ উষ্ট্র দান করলেও আমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে সম্মত নই। আজও যদি কোন উৎপীড়িত ব্যক্তি 'হে ফযূল প্রতিজ্ঞার সদস্যগণ' বলে ডাকে তবে আমি তার ডাকে সাড়া দেব।

কারণ, ইসলাম ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা এবং মযলুমের সাহায্যের জন্যই এসেছে। এ প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী হিলফুল ফযূলের সদস্যগণ বহুদিন যাবত কাজ করেন। এই সেবা-সংঘের প্রচেষ্টায় দেশের অত্যাচার বহুলাংশে হ্রাস পায়, রাস্তা-ঘাট নিরাপদ হয়ে ওঠে।

ইংল্যান্ডে 'অর্ডার অব্ নাইটহুড্' নামক যে সমিতি গঠিত হয়েছিল তার সদস্যগণও প্রায় এই ধরনের প্রতিজ্ঞাই করেছিল। কিন্তু ইংল্যান্ডের সমিতিটি 'হিলফুল ফযূল, সমিতির কয়েক শতাব্দী পর গঠিত হয়।

নিখিল বিশ্বের তরুণ মুহাম্মদ বিশ্ব-তরুণের জন্য কী সুন্দর আদর্শই না রেখে গেছেন! দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা, গরীব দুঃখীকে সাহায্য করা, সাম্প্রদায়িকতা বিসর্জন দিয়ে আপন-পর, দেশি-বিদেশি নির্বিশেষে সমানভাবে সকলের সেবা করা, অত্যাচারীকে বাধা দেওয়া, উৎপীড়িতের সহায্য করা–এটাই হলো তরুণের কর্তব্য ও ধর্ম। তরুণ মুহাম্মদ সংঘবদ্ধ হয়ে সহকর্মীদের নিয়ে কী করছে? কোথায় কোন্ ইয়াতীম ক্ষুধার তাড়নায় কাঁদছে? কোথায় কোন্ নিঃসহায় বিধবা নারী অন্ন-বস্ত্রের অভাবে কষ্ট করছে? কোথায় কোন্ শয্যাশায়ী দুস্থ রোগী সেবার অভাবে আর্তনাদ করছে? কোথায় কোন্ বিদেশি পথিক কোন্ দুর্বৃত্তের দ্বারা প্রতারিত হচ্ছে–তিনি তা খুঁজে বেড়াচ্ছেন। মূর্ত শান্তি তরুণ মুহাম্মদ কোথাও বা কোনো অনাথ শিশুকে কোলে নিয়ে দোল দিচ্ছেন, কোথাও বা রোগীর পাশে বসেই তার সেবা করছেন, কোথাও বা কোনো জনহিতকর কাজে আত্মনিয়োগ করে সমাজ-সেবার কর্তব্য পালন করছেন। এই তরুণকেই আমরা কামনা করি, আমাদের দেশ কামনা করে, সারা বিশ্ব কামনা করে।

লেখক : অধ্যাপক, আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তোমরা নয় তুমিই একজন

শেলী সেনগুপ্তা

প্রতি শনিবার শর্মী রায়ের বাড়িতে সভা বসে। শহরের অনেক কবিই সেখানে উপস্থিত হয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কবিতা পড়ে, অন্যের কবিতা শোনে, তারপর গঠনমূলক আলোচনাও হয়। সব মিলিয়ে চমৎকার আয়োজন। প্রতিবারের মতো এবারও আমার নিমন্ত্রণ ছিলো।

শর্মী রায়ের নিমন্ত্রণের বিশেষত্ব হলো, কবিতা পাঠ ও আলোচনা শেষে ভরপেট খাওয়া। এটাও বেশ উপভোগ্য। খাবারটাও হয় ব্যতিক্রমী, একেবারেই বাঙালিআনা খাবার, কখনো শুধু ভর্তা ভাত, কখনো ডাল সবজি এবং ছোট মাছের চচ্চড়ি। সময় বুঝে লুচি তরকারিও। সবাই বেশ পছন্দ করে। অপেক্ষায় থাকে শর্মী রায়ের আমন্ত্রণের জন্য।

ব্যস্ততার জন্য সবসময় আমার যাওয়া হয় না , যখনই যাই অনেক আনন্দ নিয়ে ফিরে আসি।

শর্মী রায় আমার দীর্ঘদিনের কবিতা-বন্ধু। ফেসবুকে কবিতা পড়তে পড়তে আলাপ। ওর লেখা ছোট ছোট কবিতাগুলো পড়ে, আমি অনেক বড় করে কমেন্ট লিখতাম। প্রত্যেকটা কবিতা পড়লে মনে হতো, শর্মী যা বলছে তা আমার বলার কথা ছিলো। কান্নাগুলো, হাসিগুলো আমার। কবিতা পড়েই শর্মী আমার বন্ধু হয়ে গেলো। ওর উৎসাহে আমারও কবিতা লিখা শুরু। আমরা পরস্পরের সুখ-দুঃখ ভাগ করে নিতে শুরু করলাম। শর্মী আমার খুব কাছের কেউ হয়ে গেলো।

আমাদের একটা ভালো বন্ধুর দল হলো, সবাই প্রায় একই বয়সী, আমাদের একসাথে বেড়ানো, আড্ডা দেয়া বেশ চলে। শর্মীর নেশা কবিতা চর্চা আর পেশা বুটিক শপ। ওর দোতলা বাড়ির নিচতলাতে বুটিক আর দোতলায় সে বসবাস করে। ছাদে কবিতা আড্ডা। বেশ গুছিয়েই জীবনযাপন করছিলো। হাসিখুশি আর প্রাণবন্ত শর্মী সবার খুব প্রিয় একজন মানুষ।

শর্মীর বুটিকের নাম শর্মীরাজ ফিউশান। বেশ চালু সপ। প্রচুর ক্রেতা আসে, সবার সাথে ও প্রাণ খুলে কথা বলে, তাই ক্রেতারা ওকে খুব পছন্দ করে।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে ফোনে কথা বলা, ম্যাসেজ আদান-প্রদান বেশ চলে। সব কিছু নিয়েই বেশ হৈ হৈ আনন্দের মধ্যেই থাকে সে।

আমাদের আরেক বন্ধু রচনার কাছেই শুনলাম, একা থাকা শর্মীর একজন প্রেমিক আছে, নাম রাজন, ওরা হরিহর আত্মা।

রাজনের নামের সাথে নিজের নাম মিলিয়ে বুটিক সপের নাম রেখেছে। এটা নিয়ে বন্ধুরা বেশ মজা করে, তাতে শর্মীও বেশ আনন্দ পায়।

রাজন আর শর্মীর সম্পর্কটা আমরা বন্ধু মহল বেশ উপভোগ করতাম। মাঝে মাঝে

ক্ষেপাতাম, আর সে অট্টহাসিতে ভেঙে পড়তো। আমরা বন্ধুরা একসাথে হলেই 'শর্মী-রাজন' প্রসঙ্গ আসবেই, এটা যেন অবধারিত।
আমরা সবসময়ই শর্মীর কাছে রাজনের কথা শুনতে চাইতাম। সেও হেসে হেসে গল্প করতো, সুখের আলোয় ঘেরা শর্মীকে দেখতে দেখতে আমরা নিজেদের না পাওয়াটুকুর জন্য গোপন দীর্ঘশ্বাস লুকাতাম।
একদিন তো আমি বলেই ফেললাম,
- কি করে এতো ভালোবাসিস রে শর্মী?
সেই স্বভাবসুলভ অট্টহাসিতে ভেঙে পড়তে পড়তে বললো,
- সমর্পণ শুধুই সমর্পণ রে বন্ধু, নিজেকে ওর চেয়ে আলাদা দেখি না কখনো।
- বাব্বা, তোর কাছে শিখতে হবে ভালোবাসার গোপনমন্ত্র।
- ভাবছি একটা স্কুল খুলবো-
বলেই আবার হাসি।
শর্মীকে ঘিরেই আমাদের বন্ধু মহলের দিন কাটে। মন চাইলেই লম্বা ট্যুরে চলে যাওয়া, মাঝরাতে গাড়ি নিয়ে রাস্তায় বের হওয়া, এ হলো ওর সবসময়ের কাজ। কখনো কখনো আমরাও ওর সাথে যোগ দেই।
তারপরও পরিপূর্ণ শর্মী মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যায়, কি যেন ভাবে, চোখে মেঘের ছায়া, যা ওর আনন্দময় অভ্যাসের জীবন থেকে বিষাদের খাঁদে নামিয়ে নিয়ে যায়। পূর্ণিমার রাতগুলোতে শর্মীর দিকে তাকানোই যায় না। উদার হস্ত চাঁদের আলো যখন মিতালী জমায় শহরের আনাচে কানাচে তখনও তাকে স্মৃতির ভারে কাতর হয়ে হতাশ নয়নে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখা যায়। তখন খুব পাশে থেকে ডাকলেও সারা পাওয়া যায় না, নিজের মধ্যে ডুব দিয়ে থাকে সারাক্ষণ।
এবার একটু বেশিদিন ধরে মন খারাপ। আমরা ওকে এতোই ভালোবাসি যে ওর মন খারাপ আমাদেরও প্রভাবিত করে।
আমি মাত্র ফিরেছি দেশের বাইরে থেকে, আসার আগেই পরিকল্পনা করে এসেছি, বন্ধুরা মিলে খুব ঘুরে বেড়াবো। সারাক্ষণ আনন্দে থাকবো। কী আশ্চর্য, ভাবলাম এক হলো আরেক। এসেই দেখি, শর্মী নীরব, এবার শুধু নীরব নয়, নিজেকে গৃহবন্দী করে রেখেছে।
রচনা বললো,
অনেকদিন ধরে শর্মীর মন খারাপ রে।
কেন? কি হয়েছে?
- কি হবে আবার, সেই রাজন-সমাচার। কর্মচারী মেয়েটা আর ম্যানেজার মিলে বুটিক সামলাচ্ছে। মন দিয়ে ব্যবসাটা সামলে নিচ্ছে। দিনশেষে রিপোর্ট করার জন্য শর্মীকে খুঁজেও পায় না।

আমরা বন্ধুরাও খুঁজছি আমাদের প্রাণের স্পন্দনটিকে।
আমরা অর্থাৎ আমি আর রচনা দাঁড়িয়ে আছি শর্মীর বাড়ির ছাদে। আমাদের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়ানো শর্মীর চোখ আকাশের দিকে। চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে সারা শহর। ছাদের ওপর ঢেউয়ের মতো দুলে দুলে উঠছে জ্যোৎস্না। অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে একটা বাঁশির সুর, কেউ একজন বাঁশি বাজিয়ে চলে যাচ্ছে শর্মীর বাড়ির পাশের রাস্তা দিয়ে। সুরটা কান্নার মতো, প্রার্থনার মতো ঘিরে রেখেছে শর্মীকে। কাঁদছে শর্মী, কাঁদতে কাঁদতে ভেঙে যাচ্ছে, নিজেকে তছনছ করে কাঁদছে, একসময় কান্না থামিয়ে নিজেকে গুছিয়ে নিলো এ যেন ঝড়ে নুয়ে পড়া বৃক্ষের মাথা তুলে দাঁড়ানো।

আমি কিছু বলতে গেলে রচনা থামিয়ে দিলো। আমরা ছাদের দোলনায় বসলাম। নানাভাবে গল্প জমানোর চেষ্টা করছি। ঠিক জমে উঠছে না।
রচনা অনলাইনে খাবার অর্ডার করলো। পরোটা আর তন্দুরি চিকেন। শর্মী আমাদের সাথে শান্তমনে খাবার খেলো। শর্মীকে ওর শোয়ার ঘরে রেখে আমরা ফিরে যাচ্ছি।
আমাদের মন খারাপ। ওর মতো একজন সুগঠিত মনের মানুষকে এভাবে ভেঙে পড়তে দেখে খুব কষ্ট হচ্ছে। ফেরার সময় কেউই কোন কথা বলতে পারলাম না।
এর মধ্যে পারিবারিক কাজে আমাকে আবারও আমেরিকা যেতে হলো, ফলে অনেকদিন শর্মীর সাথে দেখা হয় নি। ওর জন্য মন কেমন করছিলো। সেখানে গিয়েও নানা কারণে যোগাযোগ হয় নি। মাঝে মাঝে ফেসবুকে ওর কবিতা পড়ি, ভালোই লাগে, মনেই হয় না খুব একটা দূরে আছি।
মাসখানেক পরে ফিরে এলাম। রচনার সাথে কথা বলে সিদ্ধান্ত নিলাম আজই শর্মীর বাড়ি যাবো।
রচনা বললো,
- শর্মী এখন গ্রামের বাড়িতে আছে।
- হঠাৎ?
- তুই তো বাইরে ছিলি তাই জানিস না, রাজনের সাথে শর্মীর মনোমালিন্য চলছে।
- বলে কী? 'শর্মী-রাজনের মনোমালিন্য' পৃথিবীর আশ্চর্যতম ঘটনা, কিন্তু কিভাবে? কেন?
- এতো প্রশ্ন একসাথে করলে জবাব দেবো কি করে?
- রাখ তুই, আমি আসছি তোর বাসায়, তখন শুনবো।
অফিস শেষ না করেই বেরিয়ে পড়লাম, আমার আর তর সইলো না। রচনা চায়ের জল চাপিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছিলো। আমাকে ড্রইং রুমে বসতে দিয়ে চা নিয়ে এলো।
রচনা একটা কলেজে পড়ায়, ব্যস্ততা কম থাকলে আমাদের উড়াল-দলের সাথে জুটে যায়। ব্যস্ততা থাকলেও সময় এদিক ওদিক করে নেয়। আসলে রচনা আর আমি শর্মীকে ঘিরে আনন্দে ভেসে বেড়াতে ভালোবাসি।
উদ্বিগ্ন আমার দিকে তাকিয়ে রচনা বললো,
- শোন, শর্মী ভালো নেই রে। খুব কষ্ট পাচ্ছে।
- কেন?
- শর্মী জেনে গেছে রাজনের সাথে অনেক মেয়ের সম্পর্ক, প্রথমে বিশ্বাস করেনি, পরে নিশ্চিত হয়েছে, সেই থেকে খুব কষ্ট পাচ্ছে, কারো সাথে কথা বলছে না, দেখাও করছে না।
- আমাদের কি কিছুই করার নেই?
- আমি চেষ্টা করেছি, সারা পাই নি। তুই এসেছিস, এবার নাহয় দু'জনেই একসাথে যাবো ওর কাছে।
- বেশ তাহলে এখনই চল।
- তুই চা শেষ কর, আমি শাড়ি পালটে আসছি।
রচনা ভেতরে গেলো, আমার আর চা পান করা হলো না।
শর্মীর বাড়ির সামনে আসতেই দেখি, শর্মী এবং রাজন হাত ধরাধরি করে বাইরে থেকে

ফিরলো। আমাদের দেখে দু'জনেই হেসে উঠলো। হতভম্ব আমরা ওদের সাথে ভেতরে গেলাম। আমাদের বসিয়ে রাজন রান্নাঘরে চলে গেলো।

আমাদের সামনে রকিং চেয়ারে বসে শর্মী দোল খাচ্ছে। ওর কান্ড দেখে আমি আর রচনা রেগে যাচ্ছি। মুখ দিয়ে কোনো কথাই বের হচ্ছে না, মিটিমিটি হাসছে।

রাজন চার মগ কফি নিয়ে এলো। একটা মগ নিয়ে শর্মীর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বেশ নাটকীয় ভঙ্গীতে কফি পরিবেশন করলো। সেও বেশ আত্মতৃপ্তির হাসি দিয়ে হাত বাড়িয়ে মগটা নিলো। আমাদের সামনে ট্রেটা রেখে একগাল হাসি দিয়ে বললো,

- হে আমার প্রেয়সীর বন্ধুরা, অধমের হাতের কফি পান করুন।

শর্মী হা হা করে হেসে ফেললো। আমরাও রাগ চেপে কষ্টে হাসলাম।

বেশ কিছুক্ষণ বসে থেকেও গল্প জমলো না। গল্পে ক্ষান্ত দিয়ে রাজনও যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালো। বের হওয়ার সময় শর্মীর কপালে আলতো চুমু দিয়ে গেলো। শর্মীও হেসে কপালে হাত রাখলো।

আমরা উঠে দাঁড়ালাম, বসে থাকতে ভাল লাগছে না। যার জন্য বার বার এতো কষ্ট পাচ্ছে তার সাথে ওর এই মাখামাখিটা মেনে নিতে পারছি না।

শর্মী আমাদের রাগের কারণ বুঝতে পেরেছে, তাই দরজা পর্যন্ত আসতেই পেছন থেকে বলে উঠলো,

- আমার কোন কথা না শুনে চলে যাবি? একবারও জানতে চাইলি না রাজনের সাথে জুড়ে থাকার কারণ।

কথা বলতে ইচ্ছে করছে না।

শর্মীর জোর করে আমাদের ছাদে নিয়ে গেলো। ছাদের ধার ঘেষে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। শর্মী নীরব, আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে, চোখদু'টি বার বার ভিজে উঠছে।

আমরা ওকে জড়িয়ে ধরলাম,

- কেন , কেন শর্মী, কি পেলি এই সম্পর্কে? কেন এই বহুরূপীকে বার বার মেনে নিচ্ছিস?

- জীবনে কি পেলাম তা জানি না, শুধু

জানি ভালোবাসি, তাকে খুব ভালোবাসি। ওকে ভালোবাসা ছাড়া আমার আর কিছুই করার নেই রে।

- যে মানুষটা এতোজনের সাথে সম্পর্ক রাখছে জেনেও তুই তাকে ভালোবাসিস, তুই কোন ধাতুতে গড়া রে?

- সবাই সোজা পথে হাঁটে না, কেউ কেউ বাঁকা পথেও হাঁটে, রাজন তাই, হয়তো আমিও।

- তাই বুঝি তুই মেনে নিচ্ছিস?

- দেখ, রাজন যাদের কাছে যায় তারা ওর জন্য 'তোমরা' , ওর জীবনে একজন যে 'তুমি' , সে শুধু আমিই, ...

- তাহলে তোর জীবনে রাজন আসলে কী?

- সে আমার জীবনের সবকিছু, তাকে আমি বিনা শর্তে, বিনা স্বার্থে ভালোবেসেছি, তাকে ছেড়ে থাকতে পারি না।

- তাকে এতোজনের জেনেও ভালোবাসিস, এখনো একসাথে আছিস? এ কেমন কথা রে? বিশ্বাস কর, মানতে পারছি না।

- অনেক 'তোমরা'র মধ্যে যেমন আমি ওর একজন তুমি, তেমনি আমার পৃথিবীতে রাজন শুধু একজনই মানুষ, যাকে আমি যেমন ভালবাসি তেমনি ঘৃণা করি। ও আমার ভালবাসা আর ঘৃণার দ্বৈতসত্তা।

- ঘৃণা করাটা স্বাভাবিক, তারপরও জানতে ইচ্ছে করছে এমন একজন মানুষের সাথে এখনও সম্পর্ক রেখেছিস কেন?

- ওর পতন দেখার জন্য, আমি একজন অনুতপ্ত রাজনকে দেখার জন্য। আমি চাই অন্তত একবার সে তার ভুল বুঝুক, সেদিন তাকে আমার ক্ষমায় ঠাঁই দেবো ...

সদা হাস্যময়ী শর্মীর দু'চোখে দুই নদী বয়ে যাচ্ছে, আর আমরা নীরবে দেখছি...

লেখক : সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

রাহুগ্রস্ত চাঁদের মতো

আবু জাফর আবদুল্লাহ

হাত বাড়ালেই যদি হাত পাওয়া যেতো
তাহলে দুঃখের আঙ্গিনা থেকে মিলিয়ে যেতো
নিথর নিস্তব্ধ অন্ধকারগুলো
বিছানা হয়ে উঠতো সুস্বপ্নের
উজ্জ্বলতর আকর্ষণ।

দুঃখের জন্যে, বিষন্নতার জন্যে কেউ-ই
অপেক্ষা করে না, তবু আকস্মাৎ নেমে আসে তা
চোখের সম্মুখে অর্বাচিন ব্যাকুলতার মতো।
কোনো এক কিশোরীর বুকের কোমলতা
পেয়ে ভুলে গিয়েছিলাম তাকে বুঝে নিতে।

নারীর চোখের ভাষা, নীরবতার ভাষা যে সহজে
বুঝে নিতে পারে, আসলে সে-ই বিজয়ী।
নয়তো ব্যর্থতা এসে অচিরেই তার গ্রাস করে
সকল প্রত্যাশাকে রাহুগ্রস্ত চাঁদের মতো।

এক হৃদস্পন্দন

কামাল বারি

...কেমন লাগে পাখির ওড়া?
পাখির ওড়াউড়ি ছটফটানি কেমন লাগে তোমার
কাছে?
উড়ে-যাওয়া পাখি দেখেছো কখনো?

হায়, উড়ে যায়...!
গ্রিবা তার নক্ষত্রে রং খেলে–!
অদ্ভুত টানটান দেহ...!
চঞ্চুতে জল-স্থল-অন্তরিক্ষের স্মৃতি-শ্যাওলা
এবং ডানায় প্রকৃত ছন্দ তার...!

দীপিত পালকে বাতাস লেগে অবিন্যস্ত হ'তে
দেখেছো...?
শতরঙ উড়ে-যাওয়া দেখেছো কখনো?
অতো দূর থেকে চোয়ালের রঙ
পাখনার বাজনা বোঝা যাবে না তো!
কোনও কারুকার্য দেখা যাবে না সুদূর বিহঙ্গের;
অথচ, এক হৃদস্পন্দন...।

কেঁপে ওঠে সেলাইয়ের ঠোঁট

শাহীন আল মামুন

বহমান নদীও সংসার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে
নিজের একটা গল্প তৈরি করে;
প্রতিটি গল্পের মতো চরিত্রের উত্থান-পতন হয়
সময়ের চিহ্ন রেখে;

অবিরাম হাওয়ার মায়াজাল–
বাসনাচিত্র ছুঁয়ে যায় কাঁচা রঙ;
কেঁপে ওঠে সেলাইয়ের ঠোঁট–
নির্ধারিত প্রেম, অভিযোগ খোঁজে প্রার্থনায়;

বহমান নদীর মতোই
অমানিশার চাঁদও মুখ ফিরিয়ে নেয়...।

শ্রীকৃষ্ণের শুভ জন্মতিথি জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে একটি বিশেষ রচনা যুগে যুগে নানা রূপে

শ্যামল দত্ত

'কানু বিনে গীত নাই' বাংলা সাহিত্যে এই প্রবাদ দীর্ঘ দিন ধরে চলে আসছে। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন দশম শতাব্দীর চর্যাপদ, এরপর দ্বাদশ শতাব্দীতে বড়ু চণ্ডীদাস রচনা করেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। এটি মধ্যযুগের প্রথম কাব্য। তাই বলাই বাহুল্য 'শ্রীকৃষ্ণ' এই নামটি হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান করে নিয়েছে। বাংলা ভাষায় শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে অসংখ্য গীত, কবিতা এবং গদ্য রচিত হয়েছে। বাঙালি কবি জয়দেব রাধা-কৃষ্ণকে নিয়ে গীতগোবিন্দ রচনা করেছিলেন, যার ভাষা ছিল সংস্কৃত। তবে এ সবই মূলত রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকাহিনি। বড়ু চণ্ডীদাস তাঁর শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে বেশ কিছু দৃশ্যকল্প রচনা করেছেন, যা একান্তই বাঙালির। বাঙালির ঘরোয়া দৃশ্যচিত্রই যেন ভেসে উঠেছে কাব্যের পঙ্‌ক্তিমালায়। যেমন, শ্রীমতী রাধা নিজের গৃহে রন্ধন কাজে ব্যস্ত, এমন সময় শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি বেজে ওঠে। বাঁশি শুনে রাধার মন আকুল করে। রাধা তাঁর প্রেমের দূতী বৃদ্ধা বড়ায়ির উদ্দেশ্যে বলে ওঠেন–

কে না বাঁশী বাএ (বাজায়) বড়ায়ি কালিনী নই কূলে।
কে না বাঁশী বাএ (বাজায়) বড়ায়ি এ সোঠ গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মোর আউলাইলোঁ রান্ধন॥
১...

কাব্যের ভাষা এবং শব্দ চয়নেও যেন অতি সাধারণ বাঙালি মনের আকুতি প্রকাশ পায়। এর সরল অর্থ এ রকম : কালিনী নদীর কূলে কিংবা গোকুলের যে মাঠে রাখাল বালকেরা ধেনু চরায়, সেখানে কে অমন করে বাঁশি বাজায়! সেই বাঁশি শুনে আমার মন আকুল হয়, আমি আমার রান্নাও ভুলে যাই।

সনাতন ধর্ম অনুসারে ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। স্রষ্টা বা ঈশ্বর সম্পর্কে বলা হয়, 'একমেবাদ্বিতীয়ম'। অর্থাৎ তাঁর কোনো দ্বৈত সত্তা নেই। উপনিষদ্-এ বলা হয়েছে–

ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে
ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম্।
স কারণং করণাধিপাধিপো
ন চাস্য কশ্চিৎ জনিতা ন চাধিপঃ॥

সংস্কৃত এই শ্লোকের অর্থ হচ্ছে, এই ব্রহ্মাণ্ডে তাঁর কখনও কোনো প্রভু ও নিয়ন্তা নেই। তাঁর প্রভেদসূচক কোনো লিঙ্গও নেই। তিনি সৃষ্টি স্থিতির কারণ এবং অন্তর-বাহ্য সমস্তাদির অধিপতিরও অধিপতি। তাঁর কোনো স্রষ্টা নেই, কোনো অধিপ নেই।
২...

তবে সনাতন ধর্মমতে ঈশ্বর বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপে অবতীর্ণ হন। এজন্য তাঁর নামও হয় ভিন্ন ভিন্ন। এই বিষয়টিকে অনেকেই 'বহু ঈশ্বর' বলে ভুল করেন। শ্রীমদ্ ভাগবদ্ গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন–

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥

এর অর্থ : আমার জন্ম ও মৃত্যু নেই, আমি সকলের ঈশ্বর। তবুও আমার আত্মমায়া দ্বারা আমি প্রাকৃত রূপে অবতীর্ণ হই।
৩...

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন বিষ্ণুর অষ্টম অবতার। ভগবান বিষ্ণুকে মহাবিশ্বের রক্ষক হিসেবে কল্পনা করা হয়। যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন অবতার রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে তিনি পৃথিবীকে অধর্ম ও অন্যায় থেকে রক্ষা করেছেন। তাঁর দশটি ভিন্ন ভিন্ন অবতার হচ্ছে : মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কি। ভগবান বিষ্ণুর প্রথম অবতার মৎস্য। মহাপ্রলয় থেকে জগৎকে উদ্ধারের জন্য তিনি এক বিশাল মৎস্যের রূপ নিয়েছিলেন এবং একটি নতুন যুগের সৃষ্টি করেছিলেন। এরপর অমৃতের সন্ধানে সমুদ্র মন্থনকালে